শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীসত্যধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার

ঐতিহাসিক রহস্য।

৺হারাধন পাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ,

শ্রীসত্যধন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত
ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

Published By—
S. D. MUKHERJEE
126 LINTON STREET.

PRINTED BY—N. MUKHERJEE.
BASANTI PRESS.
71 SASHI BHUSAN DEY STREET.

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রকাশকের নিবেদন

পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য—সত্যানুসন্ধানে সহায়তা (১)-(৫)

উদ্বোধন

পুস্তকে অরুচিকর বিষয় এবং অনধিকার চর্চ্চার পরিহার (৭)-(৮)
লেখকের অকিঞ্চিৎকারিতা, কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম উভয়েই একভাবাপন্ন ... ... (৯)-(১১)

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস

সুসমাচার ও পুরাণ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ট বা খৃষ্ট, শ্বেতদ্বীপ ও কানন দেশ ১-৬
ঈশ ও ঈশা, যদু ও যুদা বংশ, বিঞ্জামিন ও বৃষ্ণি, কংস ও কংসল ৭ ১১
শ্রীমধুসূদন সরকার ও শ্রীবীরেশ্বর সেন মহাশয়দ্বয়ের মত ১১-১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিধা ও আচার

দৈববাণী, কৃষ্ট ও কৃষ্ণের উপাধি সমূহ ... ১৮ ২১

বিষয় পত্রাঙ্ক
ত্রিত্ব (খৃষ্টান তত্ত্ব হিন্দু আকারে) ... ২২
গোশালায় জন্ম ও দামোদর নাম, আকাশ প্রদীপ ২৩-২৫

তৃতীয় অধ্যায়।

অবয়বে সাদৃশ্য

ম্যাডোন্না ও কৃষ্ণ-যশোদা, ক্রুশারোপিত খৃষ্ট ও বংশীবদন কৃষ্ণ ২৫-২৭
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, উত্থানিক বা অঙ্গপরিবর্ত্তন ... ২৭-২৮
কাল অথচ মনোহর, নির্দ্দোষ মনুষ্যমূর্ত্তি ... ২৮-২৯
বস্ত্র, মুকুট, বংশী ও শ্রীবৎস চিহ্ন ... ২৯-৩১

চতুর্থ অধ্যায়।

ঐতিহাসিক রহস্যভেদ

বেদে নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয়, নৈতিক শিক্ষা, পাপপুণ্যে ভেদজ্ঞান ও পুরুষ যজ্ঞ ৩১-৩২
বৈষ্ণবগণ ও অবতারবাদের প্রাদুর্ভাব ... ৩২-৩৩
বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র ও অন্যান্য অবতারগণ ... ৩৩-৩৫
মহাভারত—রচনাকাল ও আদি অবস্থা ... ৩৫-৩৭
শ্রীকৃষ্ণ উপাখ্যান ও ভাগবদ্গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত ৩৮-৪০
মহাভারত কল্পনা প্রসূত রচনামাত্র, পুরাবৃত্ত নহে ... ৪০-৪১
হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ ৪১-৪২
পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্ম পুরাণ ... ৪৩-৪৪
অগ্নি পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ... ৪৪-৪৫
✓ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল, হিউয়েন সিয়াং ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ... ৪৬-৪৮

পঞ্চম অধ্যায়।

গীতা

রচনাকাল ও আদি অবস্থা ৪৮-৫২

গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এবং গীতাতেও বহুল প্রক্ষেপকার্য্য ৫৩ ৫৫

শঙ্করাচার্য্য, প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ও কেরল পণ্ডিতগণের মত ৫৫-৬১

শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস, কৃষ্ণ অবতার নহেন, সাধক ও ব্রহ্মাস্ত উপদেষ্টা মাত্র ৬২-৬৩

গীতার রচয়িতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ ঋষি ... ৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জীবনাখ্যা

কাল নির্ণয়, জন্ম ধাতুসম্বন্ধবিহীন, সূতিকা গৃহ ... ৬৪-৬৭

জন্ম নক্ষত্র, অঙ্গপরিবর্ত্তন বা ঔত্থানিক, দ্বাদশনাম বক্ষে ধারণ ৬৭-৭০

গোপূজক মিশর দেশে পলায়ন, শিশুহত্যা, অসুরীর দেহত্যাগ ও স্বর্গারোহন ৭০-৭২

বিহঙ্গ, আত্মাকর্ত্তৃক শূন্যে বহন, দ্বাদশরাখাল, অগ্রগামী বীর ৭২-৭৪

বিষয় পত্রাঙ্ক
কুব্জাকে ঋজু করণ, মৃতসঞ্জীবন ৭৫
অন্ধকে চক্ষুদান, কুষ্ঠরোগ আরোগ্য, বস্ত্রহরণ ... ৭৬-৭৭
প্রাণভয়ে গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ, বনভূমে দশসহস্রকে আহার যোগান, শিষ্যগণের পদধৌত করণ ... ৭৭-৭৮
সর্পের মস্তক চূর্ণ, ধর্ম্ম সংস্কার ও উপদেশ ... ৭৯-৮১
বৃক্ষোপরি মৃত্যু, দেহের স্বর্গে গমন, আততায়ীনকে ক্ষমা, ৮২-৮৫

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট

উভয় জীবনের তুলনা, লেখক পূর্ব্বে খৃষ্ট বিদ্বেষী, কংসল বধ ৮৫-৮৭
মুষলং কুলনাশনং, যুগান্তে প্রভু আবার আসিবেন, ৮৭-৮৯
শ্রীকৃষ্ণ ও আরাধিকা, যমুনা ও যর্দ্দন, গাওলা ও গোয়ালা ৮৯-৯২
কতকগুলি শব্দের বিকৃত অনুকরণ ... ৯২-৯৩

উপসংহার

খৃষ্ট জীবনের বহু ঘটনার বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত অনুকরণ ৯৪-১০০
পাঠকের প্রতি নিবেদন, শলোমন রাজার প্রজ্ঞাসূচক উক্তি ১০১-১০২

প্রকাশকের নিবেদন।

আধুনিক হিন্দুসমাজে শ্রীকৃষ্ণ যে আরাধ্যগণের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং অবতাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি, এই হিন্দুসমাজ মধ্যেই বহুজনের এরূপ ধারণা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নামে কখন কোথাও কোন অবতার জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং মহাভারত. ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ সমূহে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে সমস্তই বাইবেল কথিত যীশু খৃষ্টের জীবন বৃত্তান্ত হইতে অপহৃত হইয়া পরিবর্ত্তিত এবং ফলত বিকৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার কল্পনা করিয়া তাঁহাতে অর্পণ করা হইয়াছে।

আবার অন্য এক দল লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক, ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতে এই যুদ্ধ খৃষ্টের চৌদ্দ পনের শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণ মহাভারতোক্ত জ্যোতিঃ সংস্থান নির্ণয় কবিয়া দেখিয়াছেন. খৃষ্টের চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যদিকে ইহা

সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরাণগুলি খৃঃ সপ্তম শতকের পর রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল গ্রন্থে বিবৃত কৃষ্ণচরিত তাঁহার অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পরে লিখিত, অতএব ইহা নিশ্চয় যে, পুরাণকারেরা দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের কথা বিশেষ কিছুই জানিতেন না, কারণ তাহার লিপিবদ্ধ কোনই বিবরণ ছিল না, এবং তাঁহাদের পক্ষে বিশদভাবে কৃষ্ণচরিত বিবৃত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অপর পক্ষে, খৃষ্ট শিষ্য সাধু থোমা (St. Thomas) প্রথম শতকের মধ্যেই ভারতবর্ষে আসিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার এবং খৃষ্টীয় এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন, এবং পুরাণকারগণ দুই নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই সুযোগ বুঝিয়া "খৃষ্ট জীবনের উল্লিখিত বিবরণগুলি বিকৃত এবং বহুগুণিত করিয়া কৃষ্ণচরিতে আরোপ করিয়া, অবশেষে কৃষ্ণকে একেবারে ঈশ্বরের পদে স্থাপন করিয়াছেন"। উভয়ের জীবনের অধিকাংশ ঘটনাগুলির এবং তাঁহাদের কথিত বচন সমূহের মধ্যে মিল এবং সাদৃশ্য থাকাই তাহারা যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বটে যে, মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কিন্তু তাঁহাদের মতে রচনাকালে কৃষ্ণ কথা তাহাতে ছিল না, ইহা তন্মধ্যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এই সকল বিবিধ মতগুলির মধ্যে কোনটী ঠিক তাহা নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, বিশেষতঃ সময়ের অভাবে অনেকে এই তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

তথাপি সকলেই ইহার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকেন। সেই কারণ, সর্ব্বসাধারণের সাহায্যার্থে, আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব তাঁহার আজীবন অনুসন্ধান, পরিশ্রম এবং গবেষণার ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম মুদ্রাঙ্কনের পর অল্পকাল মধ্যেই প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যায়, কিন্তু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ইহা পুনর্মুদ্রাঙ্কনে তখনি প্রবৃত্ত হন নাই, এবং দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

পরিণত বয়সেও তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইত, সুতরাং পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহ অনুসন্ধান এবং সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইতে থাকে, এমন সময়ে হঠাৎ পারের ডাক তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াতে, তিনি এপারের সকল কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহার প্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পূজা ও সেবা করিবার জন্য চলিয়া যান, কারণ তাহাই তাঁহার জীবনের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। হয়ত তাঁহার ইচ্ছা এই যে, তাঁহার পরিত্যক্ত কার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সম্পাদন করিবে, কিন্তু যাহার উপরে এই কার্য্যের ভার এখন ন্যস্ত হইয়াছে সে তাহা সম্পাদনের নিতান্ত অনুপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সেই ব্রহ্মজ্ঞান, তাঁহার বিদ্যা তাঁহার ন্যায় আগ্রহ এবং পরিশ্রমে ধৈর্য্য আমার নাই। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজে জীবনের বহুদিন পণ্ডিতগণের

মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের সহিত অধ্যয়ন, অনুসন্ধান এবং বাদানুবাদের ফলে তাঁহার যে পরিজ্ঞান জন্মিয়াছিল আমার তাহা নাই। তাঁহার বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের যে সুযোগ ছিল আমার তাহা ঘটে নাই—বাস্তবিকই আমি এই কার্য্য সাধনের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য! তথাপি, "যাঁহার কার্য্য তিনিই করেন আমি কারণ মাত্র" এই বিশ্বাসে, আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম। সহৃদয় পাঠকগণ আমার অকিঞ্চিতকারিতা জনিত দোষ ও ক্রুটী সকল মার্জ্জনা করিবেন।

আর এক কথা, আমাদের মনগত সংস্কারের ফলে অনেক সময়ে আমরা সত্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি বা জ্ঞান করিতে পারি না। মানবমাত্রেরই মনে কোন না কোন সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে, সেটী জন্মাবধি পিতা মাতা ও গুরুজনগণের নিকট যে সকল শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই ফলে মনে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদেরই কৃত কার্য্য সকল দৃষ্টান্তে বৃদ্ধি পাইয়া এমন দৃঢ়ীভূত হয় যে, তাহার ফলে অনেক সময় অনেক বিষয় প্রকৃতপক্ষে সত্য হইলেও যদি সেই সংস্কার বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা সত্য বা গ্রাহ্যযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, এমন কি যুক্তি বা তর্কেও কোন ফল দর্শে না। সেই সংস্কারের প্রভাবে সমস্ত মনোবৃত্তিগুলি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং বিচার শক্তি লুপ্ত হয় বা বিকৃত হইয়া যায় এবং মনকে সংস্কার বিরুদ্ধ কিছুই গ্রাহ্য করিতে দেয় না। ইহারই ফলে

বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের মধ্যে আজ এত বিরুদ্ধভাব। তাই পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি একটু ধৈর্য্য ও যত্নসহকারে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন, তৎপরে ধীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন এবং সত্য বলিয়া যাহা প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন হইবে কেবল তাহাই গ্রাহ্য করিবেন।

যদিও এই সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন এবং বহু নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তথাচ যাহাতে পুস্তকের কলেবর অধিক বৃদ্ধি পাইয়া পাঠকগণের বিরক্তি না জন্মায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবেই বিষয়টীর সমালোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই স্থানে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের বন্ধু, খৃষ্টীয় সমাজের প্রবীন সাহিত্যিক, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত মহাশয়কে আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য মনে করি, কেননা তিনি আমাকে আমার পরিশ্রমে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

ইহাদ্বারা যদি একজনও প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে সমর্থ হন তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইতি—

কলিকাতা,
১লা জানুয়ারী ১৯৩১।

বিনয়াবনত,
শ্রীসত্যধন মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন।

গত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, আমি ইংরাজী ভাষায় "কৃষ্ণ ও খৃষ্ট" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর হস্তগত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে উহা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায়, সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হয় নাই। সেই জন্য এইবারে সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহা প্রকাশ করিলাম।

এই গ্রন্থে আমি অরুচিকর বিষয় সমূহ একেবারে পরিহার করিয়াছি। যে সকল সমস্যা অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়াছি, তাহাতেও এবারে হস্তক্ষেপণ করি নাই। আমার বিশেষ ধারণা, শ্রদ্ধাবান ভাগবৎগণ যদি অসূয়াশূন্য হইয়া গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কোন মতে বিঘ্ন পাইবেন না। আমি বিশ্বাসমার্গের পথিক। আমি কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কোন লেখকের পথানুবর্ত্তন করি নাই; ভগবানের কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহারই গৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছি! কৃষ্টঃ কৃপাহি কেবলং।

অনেকে বলিবেন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মহাপুরুষের লীলা বর্ণনা করা আমার ন্যায় অকিঞ্চনের পক্ষে দুরাশা মাত্র।

আমি নিজে তাহা জানি এবং অকপট-হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেছি। শ্রীঈশ কৃষ্টের জীবনচরিত লেখক পরম ভাগবৎ যোহন লিখিয়াছেন, "আমি যাহা কিছু লিখিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কার্য্য শ্রীঈশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত বৃত্তান্ত যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থখানি এত বড় হইয়া উঠিবে যে, (আমার মনে হয়) সমস্ত পৃথিবীতেও তাহা ধরিবে না।" বাস্তবিক আমারও তেমনি মনে হয়। শ্রীমদবতারের যাবতীয় বৃত্তান্ত বিশদভাবে আলোচনা করা, এক জনের এই ক্ষুদ্র জীবনকালে একেবারে অসম্ভব।

শাশ্বত সনাতন মহাপুরুষ ঈশ কৃষ্টের জীবনে এবং পৌরাণিক মহাপুরুষ কৃষ্ণের জীবনে অপরিমেয় সৌসাদৃশ্য দেখিয়া, একজন অন্যজন হইতে ভিন্ন—এমন কথা ভক্তিহীন লোকে বলিতে পারে মাত্র। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেই এই গুরুতর আলোচনায় অতীব সংযত হইবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমার দৃষ্টিতে খৃষ্টান এবং কার্ষ্ণ এই দুইটী সম্প্রদায়ই সেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী "পাতা বিষ্ণুর" আরাধনা করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ-অবতার, মুক্তিদাতা এবং অনন্তজীবী বলিয়া স্বীকার করেন। অধিকন্তু বলেন, কলিকালে কৃষ্ণনাম ব্যতীত জীবের আর গতি নাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাস, জীবে দয়া, সংসার-বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন প্রশস্ত। উভয় সম্প্রদায়ই প্রেম ভক্তির

ঘোর পক্ষপাতী। খৃষ্টানগণ যেমন কৃষ্টের দাসগণের মধ্যে জাতিভেদ নাই বলিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণব গণও তদ্রূপ শিক্ষা দিয়া বলেন,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

এই প্রকারে উভয় সম্প্রদায়ই এক পথের পথিক। তথাপি উভয় সম্প্রদায়ই স্বধর্ম্মবিহীন হওয়াতে, ইঁহাদের মধ্যে এমন এক দুষ্ট ভাব আসিয়াছে যে, ইঁহারা দুই দণ্ড একত্র বসিয়া সদালাপ করিতে পারেন না। উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্কুচিত জ্ঞান পণ্ডিতগণ নানাবিধ কুসংস্কারে, জাতিভেদে এবং মূর্ত্তিপূজায় লিপ্ত হইয়া একেবারে পতিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের কোন কোন সম্প্রদায় এমন জঘন্য আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম সম্প্রদায় বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, তেজস্বী খৃষ্টানগণ দিন দিন ঘোর রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন হইয়া প্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত এবং বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইতেছেন।

উভয় সমাজেই ঘোর শিক্ষা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। উভয় সমাজেই প্রচুর পরিমাণে বাক্যবীরের উদ্ভব হওয়াতে, বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। নরবৈষ্ণব নরোত্তম প্রভু ঈশ বলিলেন "তোমরা সকলে ভ্রাতা" (মথি ২৩ ; ৮); "তোমরা পরস্পর প্রেম কর যেন, তোমাদের প্রেম দেখিয়া অপর লোকে জানিতে পারে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩ ; ৩৪-৩৫) ; "যে

চাহে তাহাকে দাও" (মথি ৫ ; ৪২), "অন্যের যেরূপ ব্যবহার তোমার ভাল লাগে, তুমিও অন্যের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর" (মথি ৭ ; ১২) ; ইত্যাদি বিভুমুখ-বিগলিত বচনামৃত পুস্তকেই রহিয়া গেল—কেহই ব্যবহার করিল না। শ্রীঈশানুজ্ঞাপিত সন্ন্যাস, প্রব্রজ্যা (মথি ১৬ ; ২৪-২৫),প্রেম ধর্ম্ম (যোহন ১৩; ১৪) খ্রীষ্টানগণ একেবারে পরিহার করিয়া, অবিরত সম্ভোগ-দেবতার পূজা করিতেছেন ! এই বিষম সময়ে, যিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" তিনি না আসিলে, আর উপায় নাই।

ভগবানের মানবলীলা কোথায় হইয়াছিল, তাঁহার প্রকৃত নাম কি ; কেমন করিয়াই বা আমরা মিথ্যা এবং ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া সত্যের সেবক হইতে পারিব ; কিরূপেই বা খ্রীষ্টান এবং কার্ষ্ণ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসংস্কার করা যাইবে ;—আমি এই গ্রন্থে যথাশক্তি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি জানি, যিনি প্রভুকে জানেন তিনিই আমার বন্ধু হইবেন এবং প্রভুর চরণে আমার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা প্রসূনাঞ্জলি প্রদান করিবেন। পাষণ্ডগণ চিরকালই ভক্তের শত্রুতা করিতেছে। তাহারা শত্রুতা করিবে বলিয়া, সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারিলাম না।

আমাদের দেশে পুরাণ নামধেয় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশ খানি হিন্দুসাধারণে গ্রাহ্য। বৈষ্ণব সম্প্রদায় কিন্তু কেবল ছয়খানি সাত্ত্বিক পুরাণই গ্রাহ্য এবং

অবশিষ্টগুলি রাজসিক বলিয়া তুচ্ছ করিয়া থাকেন আমি এই গ্রন্থে কেবল কয়েকখানি সাত্ত্বিক পুরাণের সাহায্য লইয়াছি। খৃষ্টানদিগের মধ্যেও শতাধিক ঈশানুকথা প্রচলিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে নিকীয় (Nicean Council) মহাসভায় কেবল চারিখানি অবশিষ্ট রাখিয়া অপর গুলি অগ্নিসাৎ করা হয়। তথাপি কয়েকখানি উপসুসমাচার অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ-সংশ্লিষ্ট চারিখানি সুসমাচার এবং প্রসঙ্গক্রমে দুই তিন খানি উপসুসমাচার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমি যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবে এই সমালোচনা শেষ করিব। আশা করি, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভাগবৎগণ অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার ত্রুটি সমূহ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

কলিকাতা, কৃষ্টদাস,
৩রা জুন ১৯১৭ সাল। শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

প্রথম অধ্যায়।

ইতিহাস।

মধ্য-এসিয়ার কানন দেশে ঈশকৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার জীবনকালে কোন সুসমাচার-পুস্তক লিখিত হয় নাই। যে চারিখানি ঈশানুকথা প্রচলিত আছে, তাহার কোন খানি খৃষ্টের স্বর্গারোহনের ত্রিংশ, কোন খানি বা ষষ্ঠি বর্ষ পরে বিরচিত। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেইগুলির সহিত চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতি সমূহের ইতিহাসের সহিত দৃঢ় ও নির্ভুল সম্বন্ধ দেখা যায়। অধিকন্তু, খৃষ্টের জন্মকাল হইতে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাস এমন সুশৃঙ্খলে লিখিত হইয়াছে যে, তন্মধ্যে কোন গোলযোগ দেখা যায় না। কেবল খৃষ্টানগণ নহে, রোমীয়, যিহুদীয়, গ্রীক, মিশ্রীয়. পারসিক, আরবিক, কল্‌দীয় প্রভৃতি জাতির ইতিহাস লেখকগণ খৃষ্টানদিগের সপক্ষে ও বিপক্ষে এত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, দুই সহস্র বর্ষের প্রত্যেক বর্ষের ইতিহাস আমরা সহজেই জানিতে পারি। ঈশকৃষ্টের আবির্ভাব, তিরোভাব, মণ্ডলী স্থাপন,

খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার, দেশ বিদেশে খৃষ্টানগণের পলায়ন, প্রভৃতি বিষয় অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। এমন কি, প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমে, গ্রীসে, ভূমধ্যস্থ সাগরের দ্বীপপুঞ্জে, মিসরে আরবে, পারস্যে, ও ভারতে খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সকল দেশে খৃষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ঈশানুকথা অনুবাদিত এবং উপাসনা-মন্দিরে পাঠ করিবার জন্য সযত্নে রক্ষিত হইত। সুতরাং ঈশকৃষ্টের জীবন চরিতে অথবা খৃষ্টানদিগের ইতিহাসে সংশয় করিবার কিছুই পাই নাই। যিহুদীদিগের ন্যায় খৃষ্টীয়ানগণও নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিশয় শ্রদ্ধাবান। তাঁহারা জানেন, ঈশ্বর নিজে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার জ্ঞান প্রেরিতদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেরিতগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন কথা যোগ দেওয়া অথবা লিখিত বিষয় হইতে কিছু বাদ দেওয়া, ঘোর নাস্তিক এবং পাষণ্ডের কার্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাইবেলে কোথাও প্রক্ষিপ্ত বিষয় নাই। যে দিন, যেখানে ঈশ্বরের আত্মা ধর্ম্মপুস্তক শেষ করিয়াছেন, সেই দিন ও সেই স্থানেই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। নূতন শাস্ত্র লিখিবার অধিকার কাহাকেও ঈশ্বর দেন নাই। কেহই অদ্যাপি বাইবেলের "আমেন" শব্দের পরে একটী শব্দও যোগ দেন নাই। লিখিত বিষয়ের মধ্যে কোন স্থলে কেহ একটি মাত্রও শব্দযোজনা করেন নাই।

পক্ষান্তরে আমাদের দেশে কোন ইতিহাস নাই। পুরাণ নামধেয় গ্রন্থগুলি একেবারে ইতিহাস নহে। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা বঙ্গদর্শনের ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসের সংখ্যায় "ভারতকলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্যজাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। ...... যে গ্রন্থগুলিন 'পুরাণ' বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।" আবার অন্যত্র (বঙ্গদর্শন, শ্রাঃ, ১২৭৯) "লঘুভারত" নামক পুস্তকের সমালোচনা করিয়া "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নাই একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। .... পুরাণ নিচয় আমাদিগের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাহা এত অসার অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক বিবরণে পরিপূর্ণ যে, তাহার মধ্য হইতে অনুমাত্র সত্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ এবং পুরাণের পরস্পর মতভেদ ও অনৈক্য থাকা প্রযুক্ত তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস হইবার পথ নাই।" বঙ্গদর্শন ৭ ও ১৮৭ পৃষ্ঠা।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও ঠিক এই

কথাই বলেন। তাঁহার প্রণীত Krishna and the Puranas নামক ইংরাজি পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন,—"ancient India, it is well known, has no history in the ordinary sense.……… Narrations and genealogies such as we find in the epics and the Puranas cannot be accepted as historical, not simply because they are mixed up with absurd and miraculous stories, but because even when they make statements which are possibly true, they are not confirmed by the contemporary history of other nations."

পুরাণের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যদ্বারা যাহা কিছু প্রতিপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কদাচ বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অপিচ "কৃষ্ণকথা" এদেশের কথা নহে; নারদ ঋষি শ্বেতদ্বীপ হইতে এই বৃত্তান্ত ভারতে আনয়ন করেন।* ভারতবর্ষে যদু ও বৃষ্ণি বংশ ছিল না। এই সকল কথা যথাস্থানে প্রমাণ করিয়াছি। পুরাণে "শ্বেতদ্বীপং ধর্ম্মগেহঃ মংশানাঞ্চ ভবিষ্যতি" এবং "শ্বেতদ্বীপ নিবাসী যঃ পাতা বিষ্ণু স্বয়ং বিভু" ইত্যাদি কথা লেখা থাকাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভারতের লোক নহেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পরন্তু এই

---

* নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা মুদা নারায়ণঃ স্বয়ম্। উবাচ পরমীশস্য চরিতং পরমদ্ভুতম্॥ ব্রঃ বৈ কৃঃ জঃ ১৮।৩।

ভাগবৎ-কথা যে শুকদেবের মুখনিঃসৃত বলিয়া অভিহিত তিনিও তাহা মহাদেবের কাছে শুনিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণকথা" যদি এদেশের কথা হইত, তাহা হইলে, মহাভারতের হরিবংশ পর্ব্বে এবম্বিধ উক্তি কেন থাকিবে, তাহাও চিন্তার বিষয়।

এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু শাস্ত্র সমূহের মধ্যে কৃষ্ণ নামধারী কয়েকজনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সকলই অবতার শ্রীকৃষ্ণকেই উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে কিম্বা প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। "ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩য় অধ্যায়, ১৭ মন্ত্রের ৬ষ্ঠ সূক্তে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইনিই মহাভারতের কৃষ্ণ কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আবার ঋগ্বেদেও কৃষ্ণ নামক এক ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যের ভাষ্যে ইহাকে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। পণ্ডিত মক্ষমূলার (Maxmuller) এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও ইহার সুচারু মীমাংসা করেন নাই। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ত শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Krishna and the Puranas পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন,—"Vasudeva was originally a particular conception of God and not a historical person and Krishna's historicity as a religious teacher is more than doubtful", অর্থাৎ বাসুদেব ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি নহেন, তিনি মানস কল্পিত ভগবানের স্বরূপ বা চিচ্ছায়া মাত্র এবং বাস্তবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-শিক্ষকরূপে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ নহেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপে তিনি বিষ্ণুপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

সর্ব্বত্রা সৌ সমস্তশ্চ বসত্যত্রেতিবৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যাৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১, ২, ১২।

সর্ব্বপ্রথমে গ্রীক ভাষায় ঈশ কৃষ্টের জীবন-চরিত রচিত হয়। যে সময়ে ভগবান শ্রীঈশকৃষ্টের মানবলীলা সংসাধিত হইয়াছিল, তৎকালে এসিয়া মাইনরে গ্রীক ভাষাই প্রচলিত ছিল। মূল গ্রীক ভাষায় লিখিত সুসমাচার গ্রন্থে তাঁহার নাম "ঈশঃ" এবং "কৃষ্ট" বলিয়া উক্ত আছে। অদ্যাপি মুশলমানগণ সেই হেতু তাঁহাকে "ঈশা" বলিয়া থাকেন। যে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সুসমাচার গ্রন্থ অনুবাদ করা হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রভুর পবিত্র নামে, সেই সময়ে উচ্চারণ বৈষম্য প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মূল ভাষার "ঈশঃ" নামটী কেহ ঈশা, কেহ য়েশু, কেহ যীশু, কেহবা যীশশ্ করিয়া ফেলিয়াছেন। মূল ভাষার "কৃষ্ট" শব্দটিও ঐরূপে কেহ খ্রীষ্ট, কেহ খৃষ্ট্, কেহ বা "ক্রাইষ্ট" করিয়া বসিয়াছেন। একে ত ম্লেচ্ছজাতির আনীত ধর্ম্ম, তাহাতে আবার

নামে এত উচ্চারণ বৈষম্য দেখিয়া হিন্দুগণ আদৌ আকর্ষিত হন নাই। কেহ কেহ আবার এদেশের পুরাণগুলি অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এই বিষম ভ্রমে পড়িয়া, সত্য ভগবান নররূপী ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুসন্ধানে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। আশা করিতেছি, এইবার যবনিকা উত্তোলিত হইবে। শ্বেত-দ্বীপ বলিয়া হিন্দু-পুরাণকারগণ যে ভূভাগ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা ভূমধ্যস্থ সাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী যুদাদেশ বলিয়া জানা যায়। ঐ স্থানের বসবাসীগণ শ্বেতবর্ণ এবং শৈল সমূহ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আবৃত। ঐ দেশেই শ্রীঈশ কৃষ্ট আবির্ভূত হন। সুতরাং ঐ শ্বেতদ্বীপ হইতে ঐ কৃষ্ট কথাই ভারতে আনীত হইয়াছে, এমন কথা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে। ঐ স্থানটীকে কানন দেশও বলা যাইত।

বস্তুতঃ শ্রীঈশকৃষ্টকেই হিন্দু শাস্ত্র কর্ত্তাগণ শ্রীঈশকৃষ্ণ করিয়াছেন, এক যদু বংশই তাহার প্রধান প্রমাণ। শ্রীঈশ কৃষ্ট যে যুদা (Judah) বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এদেশে সেইটীকে যদুবংশ করা হইয়াছে। যুদাবংশের অন্য একটী শাখা বিঞ্জামীন্ (Benjamine) নামে খ্যাত। হিন্দু পৌরানিকগণ ঐ বিঞ্জামীন্ বংশটী পুরাণে কোথাও 'বৃঞ্চি' কোথাও 'বৃষ্ণি' করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যদু ও বৃঞ্চি বা বৃষ্ণি বংশ কখন ছিল না, পক্ষান্তরে শ্বেতদ্বীপ কাননের অধিবাসী যুদাবংশ একটী অমোঘ অকাট্য ঐতিহাসিক জাতি। তাহাদের বংশের অতি বৃহৎ ইতিহাস থাকায়, যদুবংশ এদেশের নহে, এই

সিদ্ধান্তে সকলেই উপস্থিত হইবেন। পৌরাণিক যদুবংশটী নিরতিশয় কল্পনা প্রসুত অগ্রে তাহাই দেখাইব, পরে যুদাবংশের বৃত্তান্ত কিছু লিখিব।

পুরাকালে অগ্নি উৎপাদন করিবার জন্য দুই খানি কাষ্ঠ ব্যবহার হইত। ঐ কাষ্ঠের নাম "অরণি"। অরণি হইতে পুরুরবার জন্ম হয়। স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বসীর গর্ভে পুরুরবার আয়ু নামক এক পুত্র হয়। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্রের নাম যযাতি। যযাতির পুত্র যদু।* পাঠক, এই প্রকার বৃত্তান্ত কি ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করা যায়? এই যদু চন্দ্রবংশীয় বলিয়া মহাভারতে উক্ত থাকিলেও হরিবংশে তাঁহাকে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বা সূর্য্যবংশীয় বলা হইয়াছে। আমি অনুমান করি, এ সমস্তই কল্পনা। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যদুবংশীয় লোক একেবারে নাই দেখিয়াই, শাস্ত্রকর্ত্তাগণ, যদুবংশ ধ্বংস কল্পনা করিয়াছেন ; তাহাতে সংশয়াপন্ন হইবার কোনই কারণ দেখি না। সুতরাং যদুবংশীয় কৃষ্ণই যুদাবংশীয় কৃষ্টের অনুকরণ এবং কৃষ্ণ কথা বিদেশ হইতে আনীত ইহা স্বীকার করিতে হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রণীত Krishna and the Puranas পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'It will be seen that the whole genealogy of the Yadavas bears the character of a pious fabrication to establish the historicity and divinity of Krishna," (৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠা), অর্থাৎ কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই যাদবগণের এই বংশাবলী কল্পনা করা হইয়াছে।

---

* সম্ভবতঃ নহুষ, যযাতি এবং যদু বাইবেলের ইসাহাক (হাস্য), যাকুব এবং যুদা।

পক্ষান্তরে, শ্রীঈশকৃষ্ট যে যুদাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের ইতিহাস ইব্রীয়, গ্রীসীয়, রোমীয়, বাবিলনীয় এবং মিশ্রীয়, ইত্যাদি সমকালবর্ত্তী সকল জাতির ইতিহাস মধ্যে জাজ্বল্যমান বিদ্যমান রহিয়াছে। যুদাবংশটী লইয়াই বাইবেলের নূতন ও পুরাতন বিধান রচিত। আর এই যুদার বংশধরগণ সমগ্র ভুমণ্ডলে আজিও সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারাই আমাদের দেশে যিহুদী (হিন্দি য়হুদ) নামে পরিচিত। পাঠক, অনুরোধ করি, হঠাৎ চমকিত হইবেন না। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরে মত প্রকাশ করিবেন।

যে সময়ে যুদাদেশে ভগবান ঈশকৃষ্ট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে একজন রোমীয় কংসল্ (Consul) ঐ দেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি ইতুমীয় আন্তেপাত্রর পুত্র। তাঁহার নাম ছিল হেরোদ। জন সাধারণ শাসন কর্ত্তার নাম ধরিয়া ডাকা উচিত নহে বলিয়া তাঁহাকে "কংসল্" বলিয়াই সম্বোধন করিত। সকল দেশেই বোধ হয়, উপাধি ধরিয়া ডাকিবার রীতি আছে—আমাদের দেশেও আছে। এই কংসল্ হেরোদ যুদাবংশীয় লোক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিল। তিনি নিজ বৃদ্ধ পিতামহকে হত্যা

করেন। ইহা ব্যতীত ভ্রাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পুত্রহত্যা এবং বহু সংখ্যক যাজক ও পুরোহিত হত্যা করায় লোকে তাঁহাকে দৈত্য (Devil) বলিত। অনেকে তাঁহার ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছিল। এই দুষ্ট 'কংসলই' কৃষ্ট হত্যার উদ্দেশ্যে বৈৎলেহমপুরে ও তন্নিকটস্থ যাবতীয় রাখাল পল্লীতে অগণ্য শিশু হত্যা করিয়াছিলেন। উপরে যে ইতিহাস লিখিলাম, লাটীন লেখক মেক্রোবিয়ের গ্রন্থ হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে; যিহুদী লেখক যোসিফস ও তাঁহার ইতিহাসে এই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ বাইবলেও এই রাজাকে রোমীয় সম্রাট কৈসরের অধীনস্থ কংসল্ (Consul) বলা হইয়াছে। এদিকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে মথুরায় 'কংস' নামক একজন রাজার কথা পাওয়া যাইতেছে। তিনি যদু বংশীয় রাজা উগ্রসেনের পুত্র এবং মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। ভাগবতের লিখিত বৃত্তান্তে তিনি অতি নিষ্ঠুর এবং ক্রুর প্রকৃতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কংস আপনার পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; সর্ব্ব প্রযত্নে বেদবাদী তপস্বী ও যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণদিগকে এবং গাভী সকলকে বধের পরামর্শ করিয়াছিলেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে অদ্যাপি কংস দৈত্য বলিয়া থাকে। তাঁহার ভয়ে যাদবগণ দেশ দেশান্তরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কংসই কৃষ্ণবধ মানসে পুর, ব্রজ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু সংখ্যক শিশু-সন্তান হত্যা করিয়াছিলেন। এখন আমি পাঠকদিগকে

অবহিত চিত্তে এই যতু বংশ এবং ঐ তুইটী রাজার বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। যুদাদেশের রাজা (কংসল) হেরোদের বৃত্তান্ত রোমীয় এবং যিহুদীদিগের ইতিহাসে আছে। খ্রীষ্টানদিগের শাস্ত্রেও আছে। পক্ষান্তরে কয়েক খানি সংস্কৃত পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে ভারতের কংসের কোন কথাই পাওয়া যায় না। আবার যুদা দেশের কংসলের বৃত্তান্ত এবং হিন্দু কংসের বৃত্তান্ত এক। কংসলের সহিত ঈশকৃষ্টের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও ঠিক্ তাহাই ছিল, দেখা যাইতেছে। সুতরাং একই বৃত্তান্ত তুই স্থানে তুই ভাবে লিখিত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। পরন্তু বাধ্য হইয়া ইতিহাস অনুযায়ী পুরাণের কংসই প্রকৃত কংসলের অনুকরণ বলিতে হইতেছে।

যাহা হউক, আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিয়া বিষয়টি আরও স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট করিতেছি। আমার এই প্রকার মতের সপক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের যুক্তি সমূহ অনেকেই অবগত আছেন। সেইজন্য সে সকলের পুনরুদ্ধার করিলাম না। কেবল বেদসংহিতার পদ্যানুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের মত নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। কবিবর স্বয়ং হিন্দু হইয়াও খৃষ্টকে যেরূপ সমাদর করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রচিত "খ্রীষ্টপুরাণে" দেখিতে পাইবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"খ্রীষ্টের জন্মের এবং জীবন বৃত্তান্তের সহিত কৃষ্ণের জন্ম ও

জীবন বৃত্তান্তের অনেক সাদৃশ্য আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে। (১) আরমাইক ভাষায় খ্রীষ্টের পিতার নাম "অষু", কৃষ্ণের পিতার নাম "বসু"। (২) কৃষ্ণকে ঈশ বা ঈশ্বর বলে, খ্রীষ্টের নাম "ঈশা"। (৩) খ্রীষ্টের নাম ঈশু (য়ীশু), ব্রজধামে ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে লক্ষ লক্ষ লোকে এখনও কৃষ্ণকে "ঈশু" বলিয়া উল্লেখ করে। (৪) খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার পিতা মাতা দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণের পিতা মাতা তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে সেইরূপ দৈববাণী শুনিয়াছিলেন। (৫) খ্রীষ্টের শৈশবাবস্থায় পরম শত্রু হেরোদ, কৃষ্ণেরও শৈশবাবস্থায় ঠিক সেইরূপ শত্রু কংস। (৬) হেরোদ ভয়ে যোষেফ খ্রীষ্টকে লইয়া মিসরে পলায়ন করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে নন্দগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন; ইত্যাদি। ১৩১১ সালের ৮ম সংখ্যা "নব্যভারতে" শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "যীশু ও যাদব" নামক প্রবন্ধ দেখ।"

১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে "রাম ও কৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় নিম্নলিখিতরূপে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "কৃষ্ণ ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সময়ের লোক, ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক। ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, খৃষ্টের চৌদ্দ পনের শত বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণ মহাভারতোক্ত জ্যোতিঃসংস্থান নির্ণয় করিয়া দেখিয়াছেন, খৃষ্টের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ

হইয়াছিল। কৃষ্ণের জীবন-কথা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবৎ প্রভৃতিতে বিবৃত আছে। এইগুলির মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা মনে নাই—হয়ত তৎসম্বন্ধে কিছু পাঠই করি নাই। কিন্তু পুরাণগুলি যে খৃঃ সপ্তম শতকের পর রচিত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়াছি। সুতরাং পুরাণে বিবৃত কৃষ্ণচরিত তাঁহার—অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পরে লিখিত। তিনি যে বর্ষাকালে জন্মিয়াছিলেন, সে কথা মহাভারতে নাই কিন্তু পুরাণে আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরাণকারেরা কেমন করিয়া জানিলেন যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদিন বর্ষাকালে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল? তাঁহার সমকালবর্ত্তী ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষা কৃষ্ণ এমন অধিক গণ্যমান্য ছিলেন না যে, কেবল তাঁহারই জন্ম সময়টা শ্রুতিপরম্পরায় দুই সহস্র বৎসর চলিয়া আসিবার পর পুরাণকারেরা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন শিশুর কখন জন্ম হইয়াছিল তাহা অন্যের মনে থাকা ত দূরের কথা, পিতা মাতার মনে থাকে না। সুতরাং বংশপরম্পরায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে তাহার স্মৃতি থাকিবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপরপক্ষে তাঁহার তথাকথিত জন্মকালের সহিত খৃষ্টের জন্মকালের ঐক্য আছে। বাইবেল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি যখন জন্মিয়াছিলেন তখন পালেষ্টীনে বসন্তকাল। পালেষ্টীনে যখন

বসন্তকাল তখন ভারতবর্ষে বর্ষাকাল। ইহাতে হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, একের জন্ম বর্ষাকালে হইয়াছে বলিয়াই অপরের জন্মে বর্ষাকাল আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু একটীমাত্র মিল দেখিয়া এরূপ অনুমান সঙ্গত হয় না। যদি অন্য অনেক বিষয়ে মিল থাকে তবেই এরূপ অনুমান একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কৃষ্ণ ও খৃষ্টের জীবনে আমরা আরও কতকগুলি মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাই।— (১) উভয়েরই জন্মের পর স্থানান্তরিত হওয়া—কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এবং খৃষ্ট মিসর দেশে। (২) উভয়েরই জন্মের পর রাজশক্তি কর্তৃক শিশু হত্যা। (৩) য়িহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থে শয়তানকে সর্পরূপধারী বলা হইয়াছে। ইহা রূপক মাত্র। খৃষ্ট সেই শয়তান বা সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কালীয় দমন করিয়াছিলেন। (৪) উভয়ের জন্ম অলৌকিক। (৫) খৃষ্টের দিব্যরূপ ধারণ এবং কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ। (৬) উভয়েরই শোচনীয় মৃত্যু বৃক্ষের উপর। (৭) বাইবেলের নববিধান এবং গীতায় বহু সাদৃশ্য।

দুই ব্যক্তির মধ্যে যে এতগুলি সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেই এই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করা কঠিন। অবশ্যই একজনের বিবরণ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক অন্যে আরোপিত হইয়াছিল। এখন জিজ্ঞাস্য—কৃষ্ণজীবনের ঘটনাই খৃষ্টজীবনে আরোপিত হইয়াছে, না খৃষ্টজীবনের কথাই কৃষ্ণজীবনে আরোপিত

হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষ্ণের বহুশত বৎসর পরে যখন খৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তিনি যে বাল্যকালে একটী সাপ মারিয়াছিলেন, ইত্যাদি কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কেননা এ সকল বিষয়ের লিপিবদ্ধ প্রমাণ ছিল না। থাকিলেও সেই সকল কথা যে সুদূর পালেষ্টীনের লোকের জানা ছিল এরূপ কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার প্রথম শতকের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথম শতকের মধ্যে খৃষ্টশিষ্য থোমা (Thomas) ভারতবর্ষে আসিয়া খৃষ্টীয় এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন—এ বিষয়ে কিংবদন্তী আছে, মহাভারতের আদিপর্ব্বে এমন একটা দেশের উল্লেখ আছে যেখানে লোকে উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ যে খৃষ্টীয় সমাজের ইউকারিষ্ট (Eucharist) নামক অনুষ্ঠান তাহাতে সন্দেহই হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।*

খৃষ্টীয় সমাজ ভিন্ন কুত্রাপি এরূপ অনুষ্ঠান নাই। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন খৃষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের সহিত যখন ভোজন করেন তখন তিনি তাহাদের প্রত্যেককে একখণ্ড রুটী এবং একটু

---

* Encyclopœdia of Religion and Ethics নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় উপাস্য দেবতার মাংস ভক্ষণ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মদ্য (দ্রাক্ষারস) দিয়া বলিলেন এই রুটী এবং মদ্য তে মরা আমার মাংস এবং রক্ত বিবেচনা করিয়া খাও। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েই এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হইতে স্বতঃই সিদ্ধান্ত হয় যে, রক্তমাংস ভক্ষণ অনুষ্ঠানের সহিত খৃষ্ট চরিত্রের অন্যান্য বৃত্তান্তও ভারতবর্ষের লোকের বিদিত ছিল। কোন ব্যক্তিতে কিছু অসাধারণত্ব লক্ষিত হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বা অবতারের পদবীতে আরূঢ় করাইয়া দেওয়া ভারতবর্ষের লোকের প্রকৃতি-সিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় লোকের প্রকৃতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা বিজাতীয় কোন বস্তু স্বকীয় করিয়া লইতে বড় অনিচ্ছুক। এই জন্য তাঁহারা খৃষ্টের দেবত্ব দেখিতে পাইয়াও খৃষ্ট বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষে একটা সুযোগ পড়িয়া গেল। কৃষ্ণ ও খৃষ্টের নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্যই এই সুযোগ। তাঁহারা খৃষ্ট চরিত্রের উল্লিখিত বিবরণগুলি বহুগুণিত করিয়া কৃষ্ণচরিতে আরোপ করিয়া অবশেষে কৃষ্ণকে একেবারে ঈশ্বরের পদে স্থাপন করিলেন।

দুইটী অনুমানের মধ্যে এইটীই আমার অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় —তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। খৃষ্ট ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যিহুদী ধর্ম্মেরও দুই একটা ভাব কৃষ্ণধর্ম্মে বা বৈষ্ণবধর্ম্মে দেখা যায়। ঈশ্বরকে যিহুদীগণ এত ভক্তি ও ভয় করিত যে, তাঁহার

হিব্রীয় নাম যিহোবা (Jehovah) তাহারা উচ্চারণ করিত না। তৎপরিবর্ত্তে আদোনাই (Adonai) বলিত। যিহোবা বলিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টের ভাব মনে আসে; আর আদোনাই বলিতে পতি-পত্নীর ভাবের ব্যঞ্জনা হয়। খৃষ্টও তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীকে পত্নীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু এই ভাবটীকে পরাকাষ্ঠায় লইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা ভাবেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী এবং তাঁহারা কৃষ্ণের স্ত্রী। এইজন্যই তাঁহারা কাছা না দিয়া এবং তিলক-ধারণ করিয়া নারীরূপ ধারণ করেন।”

তাঁহারা আবার রাধা ও কৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঐরূপ একটী কদর্য্য, কুৎসিত এবং অশ্লীল ভাবের রচনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাইতেছে যে, সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকেন এবং তাহা খণ্ডনার্থ অদ্যাবধি কেহ কোন প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত করিতে সমর্থ হন নাই।

এই গ্রন্থের “জীবনাখ্যা” অধ্যায়ে অনেকগুলি সৌসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সমস্ত লিখিতে গেলে বিস্তৃত বাখ্যা করিতে হয় বলিয়া সেগুলি আপাততঃ প্রকাশ করিতে বিরত হইতে হইয়াছে। ভগবান প্রসন্ন হইলে, সত্বর তাহা গ্রন্থান্তরে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করা যাইবে।

সত্যমেব জয়তিঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অভিধা এবং আচার।

ইতিপূর্ব্বে যে কংসল হোরোদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, তিনি ভাববাদীগণ কথিত "যুদাবংশে এক রাজা জন্মিবেন", এই সংবাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালাতিপাত করিতেন। পরন্তু যুদাবংশের দুর্গতি নিবারণ করিতে, এবং জগতে ন্যায় ও সত্য দ্বারা শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে, এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন, ভাববাদীগণ বারম্বার এই প্রকার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ভাববাদীগণ ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত লোক, এবং তাঁহাদের কথা কখন বিফল হইবে না—হেরোদ তাহা জানিতেন। এদিকে রাজা কংসও আকাশবাণী দ্বারা, এবং ঋষির দ্বারা কথিত বাক্য ও সাধুগণ প্রমুখাৎ বিবৃত অবতার হইবার কথা, অবগত হইয়া, সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। শ্রীঈশকৃষ্ট সম্বন্ধে ভাববাণী ছিল, "এক রাজা জন্মিবেন" তাঁহাকে লোকে 'আমাদের সহিত ঈশ্বর' (Emmanuel), এই নাম দিবে। তিনি জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত দধি এবং মধু খাইবেন। তিনি মহান ও ন্যায়বান রাজা হইবেন। তিনি বালক মাত্র, তথাপি তাঁহার স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে। তিনি যুদাবংশে জন্মিবেন।

তাঁহার নাম আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা এবং শান্তিরাজ হইবে।" যিশায়াহ ভাববাদীর পুস্তকের ৭; ১৪-১৫ এবং ৯; ৬-৭ পদ দেখুন। খৃষ্টের জীবনে এইগুলি আত্মিক ভাবে কতক এবং আক্ষরিক ভাবে কতক সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যদি ঐগুলি ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ জীবনের সহিত মিলান যায়, তাহা হইলে সমস্ত গুলিই আক্ষরিক ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে, দেখা যায়। ইহা দেখিলেই, ঈশকৃষ্টের অন্যান্য উপাধিগুলিও শ্রীকৃষ্ণ জীবনে পাওয়া যাইবে বলিয়া, বিশেষ সন্দেহ হয়। আমি সেই জন্যই নিম্নে কতকগুলি উপাধির সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি।

১। ঈশকৃষ্টকে শাস্ত্রে যুদাবংশের উত্তম রাখাল বলা হইয়াছে। যিশায়াহ বলেন, "তিনি রাখালের ন্যায় আপনার পাল চরাইবেন।" যিশা ৪০; ১১। তিনি নিজে বলেন, "আমিই উত্তম রাখাল।" যোহন ১০; ১১ এবং ১৪। সাধু পৌল তাঁহাকে "মহান রাখাল" বলিয়াছেন। ইব্রীয় ১৩; ২০।* পিতর তাঁহাকে, "প্রধান রাখাল" বলিয়াছেন। ১ পি ৩; ৪ পদ। ঈশকৃষ্ট মানুষের রাখালী করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রাখাল নাম। পুরাণে কিন্তু কৃষ্ণকে গরুচরাণ রাখাল করা হইয়াছে।

২। দৈববাণী দ্বারা তাঁহার নাম রাখা হইল "ঈশ"।

---

* কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাধু পৌল এই পত্র লেখেন নাই, যাকুব কিম্বা অন্য কোন প্রেরিত ইহা লিখিয়াছিলেন। আমি কিন্তু ইহা সাধু পৌলেরই লিখিত বলিয়া মনে করি।

মথি ১ ; ১২। পুরাণে গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখিল "ঈশ"। শ্রীভাঃ ১০ম স্ক ; ২৭ অ।

৩। "জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শিশুটী দধি মধু খাইবে", এই ভাববাণী লইয়াই বোধ হয়, কৃষ্ণকে এত দধি-ননী-ভক্ত করা হইয়াছে।

৪। ঈশ কৃষ্টকে যুদাবংশের রাজা বলা হইত। মথি ২ ; ২ এবং ২৭ ; ৩৭। কৃষ্ণকেও যদুবংশের রাজা বলা হইত।

৫। ঈশকৃষ্ট যুদা বা যদুবংশের বীর এই উপাধি পাইলেন। যিশা ৯ ; ৬। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ যদুবীর বলিয়া বিখ্যাত।

৬। ঈশকৃষ্ট শাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যোহন ১ ; ৩। ইব্রীয় ১; ২। কলসীয় ১ ; ১৬। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণও সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ১০ স্ক, ৩ অ।

৭। ঈশকৃষ্ট বাইবেলে সত্য বলিয়া অভিহিত। যোহন ১৪ ; ৬। ৮ ; ৩২। শ্রীকৃষ্ণকেও এইজন্য বারম্বার "সত্য" এই নামে ডাকা হইয়াছে। শ্রীভাঃ ১০ স্ক ১৪ অ।

৮। নিস্তার-পর্ব্বের নির্দ্দোষ মেষশাবক ইব্রীয় ভাষায় "পারস্" বলিয়া উক্ত। প্রকাশিত বাক্যে খৃষ্টকে "পারস" (Parash) বলা হইয়াছে। অন্যত্র তাঁহাকে "নরসিংহ" বলা হইয়াছে। প্রকাশিত বাক্য ৫ ; ৫। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকেও "পুরুষ" উপাধি দেওয়া হইয়াছে এবং তিনিই "নরসিংহ" এই প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে।

৯। ঈশকৃষ্ট "স্বয়ং ভগবান" এবং তিনি শরণাগতের "মুক্তিদাতা", এই কথা বাইবেলে অনেকবার বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে গীতায় "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এবং "মুক্তিদাতা" বলা হইয়াছে।

১০। ভগবান ঈশ কৃষ্টই দায়ূদ রাজার আকাঙ্ক্ষিত "আশ্রয় পর্ব্বত", আর সেইজন্য তাঁহার নাম "চিরশৈল" হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও আমি "গিরি গোবর্দ্ধন", "আমি পর্ব্বত হইয়াছি", ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন এবং লোকসকলকে আশ্রয় দিয়াছেন।

১১। বাইবেলে নানাস্থানে "কৃষ্ট" নামে পরিত্রাণ হয়, বলা হইয়াছে। প্রেরিত ৪ ; ১২ এবং ১০ ; ৪৩ পদ দেখুন। পুরাণকর্ত্তারা সেইজন্য "কৃষ্ণ" নামে মুক্তি হয় লিখিয়াছেন, এবং বারম্বার নামমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

১২। বাইবেলের আদিপুস্তকে লিখিত আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে "ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে নিলীয়মান ছিলেন।" সুতরাং তাঁহার নাম "জলশায়ী" (hydro-pneuma) আত্মা বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রেও সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণ-জলশায়ী ভগবানের কথা আছে, আর সেইজন্য তাঁহার নাম "জলশায়ী" বা "নারায়ণ" হইয়াছে। ঈশকৃষ্ট সমস্ত নরলোকের পরিত্রাতা, এইজন্য আমরা তাঁহাকে "নারায়ণ" বলিতে পারি। ভাগবতে কৃষ্ণ সেইজন্য, নরের আশ্রয় নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সুতরাং এই দুই ভাবে এই দুই অবতার "নারায়ণ" ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশকৃষ্টের এই সকল অভিধা আলোচনা করিবার সঙ্গে, তিনি ত্রিত্বের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহা বলিবার প্রয়োজন দেখিতেছি। খৃষ্টান ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি 'পিতা', দ্বিতীয় 'নরাবতার কৃষ্ট' এবং তৃতীয় 'বাগ্দেতা পবিত্র আত্মা'। রোমীয় মণ্ডলী ত্রিত্বের এই তৃতীয় ব্যক্তিটী 'বাগ্দেবী' এমন ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন। আমার বিবেচনায়, পুরাণ লেখকগণ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে রোমীয় পণ্ডিত পান্তনুর নিকট ঐ ত্রিত্ব মাহাত্ম্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈজয়ন্ত (Byzantine) নগর আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রাজা দিমৈত্রেয় (Demetrius), হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং দার্শনিকদিগের কাছে পণ্ডিতপ্রবর পান্তনুকে প্রেরণ করেন। তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। সাধু জেরোম তাঁহার গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।* পান্তনু এদেশে আসিয়া কয়েক বর্ষ যাপন করেন। সাধু টমাস্ প্রথম শতাব্দীতে যে সকল খৃষ্টান করিয়াছিলেন, ইনি তাহাদিগকে সংগ্রহ করেন এবং অনেকগুলি দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতকেও নিজধর্ম্মে আনয়ন করেন। তিনি লোকদিগকে নারায়ণ, নর

---

* Pentanus, on account of the rumour of his excellent learning, was sent by Demetrius into India, that he might preach Christ among the Brahmans and philosophers of that nation. Jerome's Epistola Lxx. ade Mag.

অবতার এবং বাক্যদেবীর নামে জলাভিষিক্ত করিতেন। কেননা তিনি রোমীয় মতাবলম্বী ছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পুরাণ-লেখকগণ তাঁহার নিকটে এই খৃষ্টান ত্রিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোঽজয়মুদীরয়েৎ।"

এই স্তোত্র বা মন্ত্র রচনা করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে, অর্থাৎ মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে, হিন্দুশাস্ত্রে এই ত্রিত্বের সম্মান আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি "নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর"। তিনি ঈশ কৃষ্ট ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারেন না। অদ্যাপি কোন টীকাকার ঐ নরঞ্চৈব নরোত্তম অর্থে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম লিখিয়া যান নাই। আমার এই কথা হিন্দুগণ আপাততঃ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিছুদিন পরে এই কথার উপর নির্ভর করিয়া মহাভারত এবং পুরাণাদি রচনার অভিপ্রায় এবং কাল স্থির করা যাইবে।

১৩। ঈশ কৃষ্টের জন্ম গোশালায় হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে সাধু লুক লিখিয়াছেন যে,—মেরী "আপন প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে বস্ত্রের ফালি বেষ্টন করিয়া উদূখল মধ্যে (কাষ্ঠের যাবপাত্রে) রাখিলেন।" লুক ২ ; ৭। এই প্রকারে কৃষ্টের উদরে দাম (বসন) বেষ্টন করা হইয়াছিল

বলিয়া তাঁহাকে "দামোদর" বলা যায়। পুরাণে লিখিত আছে, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দাম (বস্ত্র) বেষ্টন করিয়া উদূখলে (কেট্কোতে) বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণের নাম দামোদর হইয়াছে। সুতরাং দামোদর নামের মূলেও দেখিতেছি সেই ঈশকৃষ্ট।

এই ঈশকৃষ্টের জন্মদিনে শিষ্যদের গৃহের পুরোভাগে একটী আলোক দেওয়া হয়। পুরাকালে এবং অদ্যাপি খৃষ্টানগণ খৃষ্ট জন্মোৎসবের পূর্ব্বরাত্র হইতে আকাশপথে এবং গৃহদ্বারে ঐ প্রকার আলোক দিয়া আসিতেছেন। সাধারণতঃ, যে নক্ষত্রস্বরূপ আলোক পূর্ব্বদেশীয় মাগধী (পণ্ডিত) গণকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই তারার স্মৃতিস্বরূপ এই আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সেই বস্ত্র বেষ্টিত কৃষ্টের সূতিকা গৃহ স্মরণ করাইবার জন্যই শীতকালে ঐ প্রকার আলোক প্রদান করিবার প্রথা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা না থাকিলেও হিন্দু সাধারণ শীতকালে ঐ প্রকার একটী আলোক প্রতি বৎসর গৃহের সম্মুখে অথবা ছাদের উপরে ঝুলাইয়া দেন। তাঁহারা উহাকে "আকাশ প্রদীপ" বলেন। পাঠক, চমকিত হইবেন না। ঈশ্বরকে ভয় করুন এবং সত্যের সমাদর করিতে সাহসী হউন। এই আকাশ প্রদীপ খৃষ্টীয়ান থার অনুকরণ মাত্র।

আমি জীবনাখ্যা অধ্যায়ে এই প্রকার অনেকগুলি সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি। অগ্রে ঐতিহাসিক রহস্যভেদ

অধ্যায় পাঠ করিয়া, পরে আপনি তাহা পাঠ এবং আলোচনা করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং।"

তৃতীয় অধ্যায়।

অবয়বে সাদৃশ্য।

একখানি চিত্রপট আমার ঘরে রহিয়াছে। ঐ চিত্রে নন্দরাণী যশোদা নিজ পুত্র কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের কপালে তিলকা, মাথায় একটী চূড়া দেখা যাইতেছে। চিত্রকর কৃষ্ণের মুখ ও মস্তকের চারিদিকে দিব্যালোকের ছটা সমূহ অঙ্কিত করিয়াছেন। ডাক্তার গফ্ (Gough) ছবিখানি দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এটী কি ম্যাডোন্না?" আমি বলিলাম, "না, উহা কৃষ্ণ-যশোদা।" তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। বাস্তবিক, যাঁহারা চিত্রপটে শিশু যীশুকে তাঁহার মাতার কোলে অবস্থিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা "কৃষ্ণ যশোদার" ছবি দেখিয়া ম্যাডোন্না (মেরী) মনে

করিবেন—আশ্চর্য্য নহে। কেবল ইহাই নহে, ক্রুশার্পিত ঈশক্রুষ্টের চিত্রে এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্রেও এই প্রকার সাদৃশ্য দেখা যায়। ক্রুশ বৃক্ষে যীশু ঝুলিতেছেন—সমস্ত দেহটী লম্বমান হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার একটী চরণের উপরে অন্য চরণ রাখিয়া একসঙ্গে একটী বজ্র অঙ্কুশ বিদ্ধ করা হইয়াছে। যন্ত্রনায় তিনি বক্র হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তক শিথিল হইয়া একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। পাঠক, একখানি কৃষ্ণের এবং একখানি ক্রুশার্পিত ঈশক্রুষ্টের ছবি লউন, এবং এই দুইটী সম্মুখে রাখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করুন।

১। যীশুর পায়ের উপরে পা আবশ্যক মতে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পায়ের উপর পা কেন?

২। খৃষ্ট যন্ত্রণায় ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন, কৃষ্ণ কি দুঃখে ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন?

৩। যীশুর মাথায় কণ্টক লতার মুকুট বিদ্রূপ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কৃষ্ণের মাথায় বন ফুল জড়ান কেন?

৪। যীশু নাশরীয় ব্রতধারী বলিয়া দীর্ঘ কেশদাম ছিল, ক্রুশে দিবার সময়ে তাহা গুটাইয়া চূড়া করা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের মাথায় চূড়া কেন?

৫। যীশুকে প্রেক (লৌহ অঙ্কুশ) দিয়া গাছে বদ্ধ করা হইয়াছিল, তাই তিনি গাছে হেলান দিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন?

৬। যীশুর গায়ে সীবনী বিহীন একখানি অঙ্গ বস্ত্র ছিল (যোহন ৯; ২৩), তাই কি সীবনী বিহীন একখানি অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা কৃষ্ণের ধড়া করা হইয়াছে? আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন এবং মীমাংসা করুন। আমি ত স্পষ্ট দেখিতেছি, অভাবনীয় সাদৃশ্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

আপনি হয় ত আমাকে অতীব কল্পনা প্রিয় ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছেন; করুন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা গুলিনও শ্রবণ করুন। ঐ যে ঈশকৃষ্টের চরণদ্বয়ে বজ্র নির্ম্মিত অঙ্কুশ বিদ্ধ করা হইয়াছিল, ঐ যে সেই বজ্রাঙ্কুশের ধ্বজ (চিহ্ন) তাঁহার চরণদ্বয়ে দেখা গেল, উহাই কি শ্রীকৃষ্ণের চরণের "ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ" নহে? টীকাকারেরা পুরাণ লেখকের কথার অর্থ জানিতেন না—তাই একটা ধ্বজা, একটা বজ্র এবং একটা অঙ্কুশ করিয়াছেন। প্রকৃত, নির্ভুল এবং যুক্তি সঙ্গত অর্থ এই,—ধ্বজ (চিহ্ন) + বজ্র (লৌহ) + অঙ্কুশ (শলাকা) একটু চিন্তা করুন, একটু ভগবানকে ভয় করুন। ব্যস্ত হইয়া আত্ম প্রবঞ্চিত হইবেন না। যীশু খৃষ্টই কৃষ্ণ। সাধু থোমা নিজ হাত দিয়া ঐ লৌহ শলাকার চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, যীশু মৃত্যু জয় করিয়া সশরীরে উঠিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নধারী ভগবান শ্রীঈশকৃষ্ট আপনার চক্ষু প্রসন্ন করিয়া দিবেন।

যুদা বংশীয় প্রথা অনুসারে যীশু খৃষ্টের অঙ্গ পরিবর্ত্তন (খৎনা) অর্থাৎ ত্বকচ্ছেদ হইয়াছিল। আমরা দেখিতে

পাইতেছি, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ পরিবর্ত্তন (ঔত্থানিক) উৎসব হইয়াছিল! হিন্দুদিগের জাতকর্ম্ম পদ্ধতিতে যদি অঙ্গ পরিবর্ত্তন প্রথা থাকিত, তাহা হইলে রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, বেদব্যাস, শুকদেব প্রভৃতির কাহারও না কাহারও অঙ্গ পরিবর্ত্তন উৎসব হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামেরও ঔত্থানিক সমাধা করা হয় নাই। এক বাটীতে এক পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত কৃষ্ণের ঔত্থানিক (অঙ্গ পরিবর্ত্তন) উৎসব হইল, কিন্তু বলরামের তাহা হইল না। ইহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, ঈশকৃষ্টের বাল্য জীবনের ঘটনা অনুসারে কৃষ্ণের ঔত্থানিক সমাধা করিতে হইয়াছে। টীকাকারগণ পুরাণ লেখকের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, একটা মন গড়া ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র। ইহা সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা এই পুস্তকের যথাস্থানে করা হইয়াছে। পাঠক তাহা যত্নসহকারে পাঠ করিবেন।

ঈশকৃষ্ট ভাববাণীতে "কাল অথচ মনোহর" (পরম গীত ১ ; ৫) বলিয়া উক্ত থাকায়, বোধ হয়, কৃষ্ণকে কাল অথচ মনোহর করা হইয়াছে। ঈশকৃষ্ট একবার শিষ্য সমক্ষে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন (মথি ১৭ ; ৩)। বোধ করি, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন সমক্ষে রূপান্তর হইলেন, বর্ণনা করা হইয়াছে।

"ঈশস্য তস্মহাবিষ্ণোঃ কিমসাধ্যং হরেরহো!"

নরাবতার ভগবান ঈশকৃষ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বাবয়বে মনুষ্যের মতন দেহ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাই শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যরূপী করিয়াছেন, বলিতে হইতেছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দুর কোন দেবতাই মনুষ্যের ন্যায় নহেন। যাঁহার কোন দোষ নাই, তাঁহার হয় চারি হস্ত, না হয় তিনটা চক্ষু, না হয় একটা শুণ্ড আছেই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের বেলায় দিব্য মনুষ্য মূর্ত্তি। ইহা ঐ আদর্শ ঈশকৃষ্টের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ভিন্ন অন্য আর কি বলিব?

মথি লিখিত সুসমাচারের২৭ অধ্যায়ে লেখা আছে, "তাহারা তাঁহার বস্ত্র লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে একখানি লোহিত-বর্ণ রাজবস্ত্র* পরিধান করাইল এবং কণ্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক গাছি নল দিল।" ২৮ ও ২৯ পদ। আমার মনে হয়, পুরাণকারগণ খৃষ্ট কর ধৃত ঐ নল এবং তাঁহার মস্তকস্থিত কণ্টকের মুকুট দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বংশীর অবতারণা করিয়াছেন এবং তাঁহার মস্তকে "কণ্টকে গাঁথা ফুলের মুকুট" অর্পণ করত শোভিত করিয়াছেন। অদ্যাবধি শ্রীক্ষেত্রে পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তিকে রাখাল ও রাজবেশ পরাইয়া থাকে, এবং রাজা সাজাইবার সময় তাহাকে "রক্ত বস্ত্র" পরিধান করায় এবং মস্তকে "কণ্টকে গাঁথা ফুলের

---

* সাধু মার্ক লিখিয়াছেন তাঁহাকে বেগুনিয়া রঙের বস্ত্র পরান হইয়াছিল। সেই কারণেই বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে পীত বসন পরিহিত কল্পনা করা হইয়াছে।

মুকুট” দিয়া থাকে, এবং এমন কি, মানব পরিত্রাতা ঈশকৃষ্টকে সৈন্যগণ যেরূপ বেত্রাঘাত, মুখে থুথু নিক্ষেপ এবং নানারূপ কদর্য্য বিদ্রূপ করিয়াছিল, অবিকল সেইগুলির নকল করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তির গাত্রে বেত্রাঘাত, মুখে থুথু নিক্ষেপ এবং তাহাকে কদর্য্য বিদ্রূপ করিয়া থাকে।*

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই লেখা আছে, “তাহাদের একজন একখানি স্পঞ্জ লইয়া সিরকা ভরিয়া সেই স্পঞ্জ নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে দিল।” ৪৮ পদ। বোধ হয়, খৃষ্ট মুখে এই নল লাগান রহিয়াছে এমতাবস্থার কোন চিত্রপট দেখিয়া পুরাণকার কৃষ্ণকে বংশীবদন করিয়াছেন এবং তদবধি যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণ চিত্র ঐ বংশীবদন হইয়া আসিতেছে। আমার এই ধারণা এক দিনের চিন্তায় দৃঢ়ীভূত হয় নাই। ত্রিশ বর্ষকাল চিন্তার পর আমি বুঝিয়াছি, এইটী অমোঘ সত্য। খৃষ্ট বলিয়াছেন, “সকলে আমার কাছে আসিতে পারে না, কেবল পিতা ঈশ্বর যাহার মনশ্চক্ষু প্রসন্ন করেন সেই, আসিতে পারে।” আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেবল শুদ্ধচিত্ত লোকেই বুঝিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে ইহা বিঘ্নদায়ক প্রস্তরস্বরূপ হইবে এবং এই প্রস্তরেই তাঁহারা উছট খাইবেন।

---

* আমার পূজনীয় পিতামহ ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রকাশ” নামক পুস্তকে ইহা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা আছে। প্রকাশক।

ঈশ কৃষ্টের কুক্ষিদেশে বড়শা বিদ্ধ করা হইয়াছিল। যোহন ১৯ ; ২০। ঐ বড়শার চিহ্ন তাঁহার বক্ষদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পুনরুত্থানের পরে সাধু থোমা (Thomas) ঐ চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। পুরাণকর্ত্তাগণ বোধ হয়, ঐ কারণে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে "শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী" আছে বলিয়াছেন এবং তাহারই "শ্রীবৎস চিহ্ন" নাম দিয়াছেন। ক্রুশার্পিত কৃষ্টের কোন প্রতিচিত্র দেখিয়াই তাঁহারা এই প্রকার গল্প রচনা করিয়াছেন।

জীবনাখ্যা অধ্যায়ে সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঐতিহাসিক রহস্যভেদ।

পাঠক, পৌরাণিক তত্ত্ব লইয়া আমি এই অধ্যায় লিখিতেছি। সুতরাং বেদ লইয়া কোন কথা কহিব না। ভারতবর্ষে, কস্মিন্‌কালে বেদের প্রাধান্য ছিল, অথবা কস্মিন্‌কালে বেদের প্রাধান্য হইবে, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। বেদে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান অথবা নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয় কিছু আছে, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আমি পাই নাই। পুরাকালের হিন্দুগণ

বেদে অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বলিয়াই, এদেশে পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মতের প্রাদুর্ভাব হয়। অবশ্য বেদ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদের ব্রহ্মকে বেদান্তের বাতি জ্বালিয়া, অনেক আবর্জ্জনা সরাইয়া, খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বেদে নৈতিক শিক্ষা তেজস্বী নহে। পাপ পুণ্যে ভেদ জ্ঞান তেমন ফুটন্ত নহে। অথর্ব্ববেদে এবং কোন কোন উপনিষদে উহা খৃষ্টীয় ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহাও দেখা যায়। অতি অল্পসংখ্যক আর্য্য ঋষিগণ ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিতেন। বৈদিক কালে ভারতে বহু দেব দেবী ছিল। ঋক্‌বেদে যে পুরুষ যজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে প্রজাপতির দেহ ধারণ এবং আত্মোৎসর্গের বৃত্তান্ত প্রাচীন নহে। উহা পৌরাণিক সময়ের রচনা এবং বেদে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকের ধারণা। ঐ ঘটনাটী ভিন্ন, বেদে ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কোন কথা আছে বলিয়া আমি জানি না। সংহিতা ইত্যাদির প্রচলন সময়েও, বিশেষতঃ উপনিষদ ইত্যাদির বাহুল্য কালে, অবতারের কোন কথাই পাওয়া যায় না। সুতরাং বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ভক্তিপথের পথিকদিগের আদৌ আলোচ্য গ্রন্থ নহে।

বৈষ্ণবগণ বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রও ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে, দার্শনিক যুগেও এদেশে অবতার বাদ ছিল না। যদি থাকিত, দার্শনিক পণ্ডিতগণ অবশ্যই তাহার একটা আন্দোলন করিতেন। খুব সম্ভব, পৌরাণিক কালেই ভারতে সর্ব্বপ্রথমে অবতার বাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে পৌরাণিক সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে অবতার বাদ আসিল, তাহা নিতান্তই বিবেচনার কথা। আমার ধারণা এই যে, প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস্ এবং সাধু বার্থলমিউ ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তক্ষশীলা (পাঞ্জাব) প্রদেশে এবং দাক্ষিনাত্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং অনেক লোককে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারাই এদেশে অবতারের কথা প্রথম আনিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্ট-শিষ্যগণের প্রভাবেই এতদ্দেশীয় পুরাণসমূহে তদবধি অবতারবাদ প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। যে সকল এদেশীয় পণ্ডিত এইরূপে ভগবান মানবরূপে শ্বেতদ্বীপে আসিয়াছেন জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পুরাণাদি রচনা করিয়া, এদেশে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়াছেন দেখাইয়া লোকদিগকে স্তোক দিয়াছেন। পাঠক, আপনি ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া, সত্যের সমাদর করিব বলিয়া দৃঢ়ব্রত হউন। সত্য আপনার নিকট অবশ্যই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণই হিন্দুদিগের একমাত্র অবতার, অন্যান্য অবতারগুলি কল্পনা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়েই পুরাণকারগণ বুদ্ধ ও রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। Sir হরিসিংহ গৌর মহাশয় তাঁহার কৃত The Spirit of Buddhism নামক পুস্তকে এই ভাবের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুরা বুদ্ধকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

রামায়ণেও রামচন্দ্র অবতার রূপে অঙ্গীকৃত নহেন। রামায়ণে রামচন্দ্র বৌদ্ধদিগকে "চৌরাঃ" বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, দেখা যায়। কল্কি পুরাণে "নিগৃহ্য বৌদ্ধান" লিখিত হইয়াছে এবং কল্কি অবতার বৌদ্ধদিগকে নিহনন করিলেন বর্ণিত হইয়াছে। (৭ম অধ্যায়)। তবে সেই ঘৃণিত বুদ্ধকে অবতার শ্রেণীতে আনা হইল কেন? ইহা ভাবিয়া দেখিলে, কৃষ্ণ যে শ্রীঈশ-কৃষ্টের অনুকরণ মাত্র, তাহাই সপ্রমাণ হয়। আমার কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রকৃত হিন্দু লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা গ্রহণ করিলেও, উপরোক্ত কথাই প্রমাণ হইবে। তাহার রচিত কৃষ্ণ-চরিত্রের ৭৭ পৃষ্ঠায় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, 'বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির ঐরূপ (অতিপ্রকৃত) কার্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসমূলক। সেই উপন্যাসগুলি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে; কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" বঙ্কিম বাবুর এই কথাই ঠিক্।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অবতার এবং তিনি সত্য অবতার ঈশকৃষ্টের নামান্তর মাত্র। হিন্দুদিগের ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের প্রসঙ্গও আছে। গীতায় অবতার অসংখ্য বলা হইয়াছে। পরবীয বুদ্ধ এবং কল্পনা প্রসূত রামচন্দ্র ব্যতীত কোন অবতারের জীবনচরিত না থাকায়, সেগুলি আবশ্যকমতে গৃহীত বলিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত অবতারের ছায়া মাত্র।

মহাভারত পুরাণগুলি সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত দেখিলাম। আমার একটা মত থাকা অসঙ্গত হইতে পারে না। মন্দার-মালার সুযোগ্য সম্পাদক, পুরাণগুলি আবর্জ্জনাপূর্ণ দেখিয়া, ধাপার মাঠের সহিত ঐগুলির তুলনা করিয়াছেন। তিনি অবতার বিশ্বাস করেন না। আবার বঙ্কিম বাবু, পুরাণগুলির কিছু বাদ ছাঁট দিয়া, কিছু লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমবাবু তাঁহার বঙ্গদর্শনে পুরাণগুলিকে ইতিহাস বা সত্য পুরাবৃত্ত বলিয়া একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিতের কথায় আমরা কিছুই বলিতে পারি না। পুরাণ লইয়া আমি যাহা বলিব তাহাতে ভিত্তি থাকিবে না। সকল স্থানে শুদ্ধ যুক্তিই আমার অবলম্বন। সেই জন্য, মহাভারত গ্রন্থখানি আমি খৃষ্ট জন্মের পরে রচিত মনে করি কেন মনে করি, তাহার কতকগুলি কারণও আছে।

মহাভারতে যবন ও যবনপুরী বলিয়া উল্লেখ থাকায়, উহা যবন-প্রাধান্যের পরে রচিত বলিয়া বুঝা যায়। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যবন ভাষা (গ্রীকভাষা) প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। সাধু থোমা ঐ যবন ভাষাতেই ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। যবন ভাষা প্রচলিত থাকার সময়ে মহাভারত লিখিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ ঐ গ্রন্থেই আছে। দুর্য্যোধনের রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের সহিত বিদুর যবন ভাষায় কথা কহিলেন উক্ত আছে।* অশোক রাজার সময়ের শৈললিপি সমূহে যে প্রকার রূঢ় প্রাকৃত ভাষা দেখা যায়, মহাভারতের ভাষা তদ্রূপ নহে। রূঢ়ভাষা এই প্রকার সংস্কৃত হইতে অন্ততঃ দুই তিন শত বর্ষ লাগিয়াছে। খৃষ্টীয় ৪০৬ অব্দে ক্রাইসোষ্টম মহাভারতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্রাইসোষ্টম তুরস্কের বিশপ (Bishop) ছিলেন। ইনি ব্যতীত ভিন্নদেশীয় কোন লোক কখনও মহাভারতের কথা উল্লেখ করেন নাই। আমার ব্রহ্মদেশে প্রবাসকালে ঐ দেশের পালিগ্রন্থনিচয়ের মধ্যে রামায়ণের অস্তিত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু মহাভারতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। অন্য কোন দেশে, কোন স্থানের পুরাবৃত্তে

---

* ভারতে সপ্তম শতাব্দীতেও যবন [গ্রীক] ভাষা প্রচলিত ছিল। বাণভট্টের হর্ষচরিতে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থে লেখা আছে, "একজন যুবা মধ্যে মধ্যে যবনপ্রোক্ত পুরাণ" বর্ণনা করিতেন। এই যবন প্রোক্ত পুরাণ নিঃসন্দেহে যীশু খৃষ্টের সুসমাচার।

মহাভারতের কথা পাওয়া গিয়াছে, এমন কোন কথাও কখন পাঠ করি নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভারত থাকিলে পান্তনু তাহার উল্লেখ করিতেন। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ মহাভারতে কৃষ্ণ অবতারের কথা উল্লেখ থাকায়, উহা ঈশকৃষ্টের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বহুকাল পরে রচিত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

আগ্রা হইতে প্রকাশিত মহাভারতের উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে, "মহাভারত প্রথমে ২৪০০০ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উহাতে ২২০,০০০ শ্লোক সঞ্চিত হওয়াতে, মূল মহাভারতে কি ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।" "The main story which occupies a little over than a fifth of the whole poem, forms the lowest layer," ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিমত। এই সকল কথা বিশেষ বিবেচ্য। মূল কথা এই যে, বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থ যেমন প্রথম সংস্করণে একরূপ ছিল, চতুর্থে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, এদেশের মহাভারত তেমনি প্রথম সংস্করণে একখানি ক্ষুদ্র পুঁথী ছিল মাত্র। ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া সপ্তদশ সংস্করণে একখানি বৃহৎ "ধাপার মাঠ" হইয়াছে। পাঠক, মনে করিবেন না যে, আমি অসূয়া পরবশ হইয়া এই কথা বলিতেছি। সাহিত্য রথী বঙ্কিম বাবুই তাহা বলিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ চরিত্রের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনিক পর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্বের গীতা, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা, উদ্যোগ-

পর্ব্বে প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, ইত্যাদি, তৃতীয় স্তর সঞ্চয়কালে রচিত।" বঙ্কিম বাবু দ্বিতীয় স্তরের কথা কিছুই বলেন নাই। না বলিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে তাঁহার সাধের কৃষ্ণ অবতার বাদ পড়িয়া যান। বস্তুতঃ, মহাভারতের প্রথম স্তরে কৃষ্ণ অবতার ছিলেন না। হয় ত একটী কৃষ্ণ নামক সারথি ছিলেন মাত্র, তিনি স্বয়ং ভগবান, অথবা অর্জ্জুনের উপদেষ্টা, অথবা রাধা বল্লভ ছিলেন না। পানিনি সূত্রে ও উপনিষদে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহা প্রয়োজনমতে প্রক্ষিপ্ত। শ্লোকের সংকীর্ণতা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বিশেষতঃ, সেই কৃষ্ণ আর এই কৃষ্ণ এক করিয়া ঐতিহ্য কন্দল উৎপাদন করা হয় নাই, তাহাই বা কি প্রকারে অঙ্গীকার করিবেন ? (ইতিহাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মহাভারতে খৃষ্টান সমাজের ইউখারিষ্ট (Eucharist) নামক অনুষ্ঠানের কথার উল্লেখ আছে। খৃষ্টের স্বর্গারোহনের পরে রচিত না হইলে তাহাতে এই বিষয় স্থান পাইল কি প্রকারে, ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। আবার দূবে (Dube) মহাশয় বলেন যে, মহাভারতে সহমরণ (সতী) হইতে দেখিয়া তিনি উহা আধুনিক গ্রন্থ বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না! বাহুল্য জ্ঞানে এই বিষয় আর অধিক আলোচনা করিলাম না। জ্ঞানবান পাঠকের পক্ষে মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয় সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে, পদ্মনাভ ঋষিই গীতা রচনা করিয়া মহাভারতে যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমার ধারণা। এতাবৎকাল, সকল পণ্ডিতেই গীতা প্রক্ষিপ্ত, গীতা আধুনিক, বলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এই প্রকার অভ্রান্ত মত এবং অবিসম্বাদী কথা বলেন নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই মত পণ্ডিত সমাজে প্রকাশিত হইবার পর হইতে অদ্যাপি কোন পণ্ডিত তাহা খণ্ডনার্থে লেখনি ধারণ করিতে অগ্রসর হন নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহাই এখন সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য অভিমত। পণ্ডিত মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে রাজা রাম মোহন রায়ের লাইব্রেরীতে, এই বিষয়টী লইয়া তুমুল আন্দোলন হয়, এবং বহু তর্ক বিতর্কের পর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যুক্তিই বলবৎ হয়। মন্দার-মালাতে সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩২৪ সালের ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মৈথিলী মহামহোপাধ্যায় কাষ্ঠ পদ্মনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। তিনি নিজ ব্যাকরণ (কলাপ) মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, হর্ষবর্দ্ধনের জীবনাখ্য (হর্ষচরিত) প্রণেতা বাণভট্টের পরে পদ্মনাভ দত্ত বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধন, ৬৪৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় লেখক মাতনলীনের

(Ma Tuan Lin) মতে খৃষ্টীয় ৬৪৮ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং বলিতে হইতেছে, ভাগবদ্গীতা সপ্তম শতাব্দীর শেষে রচিত।*

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাভারত সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত রচনামাত্র, ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস কিছুই নাই, সমসাময়িক্ কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ আছে মাত্র। মহাভারতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার রচিত Krishna and the Puranas পুস্তকের ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "Raja Ram Mohan Roy drew the attention of his countrymen to the significance of one of the very opening verses of the epic, in which the poet says to all who have ears to hear, that his work is a product of imagination and should not be taken as history. Vyasa, said to be the original composer of the poem, says to Ganesha, whom Brahma recommended to him as his amanuensis :—

লেখকো ভারতস্যাস্য ভবত্বং গণনায়ক।
ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মনসা কল্পিতস্য চ॥

---

* খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব গীতার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাণভট্টের বিবরণ "ঐতিহাসিক রহস্য" ২য় ভাগে দেখুন। এই পুস্তকের গীতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

That is, "Be thou the writer, O Ganesha, of this Bharata, which I am going to dictate to you and which I have imagined in my mind."

হরিবংশ। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজের আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ, তাঁহার সময়ে হরিবংশ পর্ব্ব রচিত এবং মহাভারতে সংযোজিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর রচনার সময়েই হরিবংশ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সাহিত্যরথী বঙ্কিমবাবু অন্য কথা বলেন। তাঁহার কথা এই যে, "পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশ-পর্ব্ব ও ভবিষ্য-পর্ব্ব আছে, বিষ্ণু-পর্ব্বের নামমাত্র নাই।······পরে বিষ্ণু-পর্ব্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" মহাত্মা কালী সিংহের মতে, "হরিবংশের রচনা প্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।" বস্তুতঃ, হরিবংশের ভাষা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লেখকদিগের ভাষার ন্যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে যদি বিষ্ণু পর্ব্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানা যায় যে, যাঁহারা ভারতে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার সাজাইবার প্রয়াস করিতেছিলেন, এই প্রক্ষেপকার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ্ ভাগবৎ পুরাণ অনুবাদ করিয়া, ঐ অনুবাদের উপক্রমণিকা

ভাগে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈয়াকরণ বোপদেব ভাগবৎ রচনা ও প্রকাশ করিবার পর, এদেশীয় শাক্ত পণ্ডিতগণ "ভাগবত পুরাণ পুরাণই নহে, প্রকৃত পুরাণের নাম ভগবতী পুরাণ" ইত্যাদি কথা লিখিয়া প্রচার করেন। রাণী ভবানীর বাটীতে এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এই সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্কও হইয়াছিল। সিদ্ধান্ত দর্পণে, কয়েক জন এ দেশীয় কুটিল বুদ্ধি লোক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকগুলি কৃত্রিম শ্লোক এবং দুই একখানি এমন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সে সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সভায় উঠে নাই। অধিকন্তু, ইহারা ভাগবতের একখানি টীকা লিখিয়া সেইখানি বোপদেব কৃত টীকা বলিয়া ঘোষণা করেন। আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ টীকাখানি "জাল" বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে সিদ্ধান্ত দর্পণে প্রকাশিত যুক্তি সমূহ একেবারে গ্রাহ্য যোগ্য নহে বলিতে বাধ্য হইতেছি। ধর্ম্মভয় এবং যুক্তি শক্তি বিহীন লোকে প্রায়ই মিথ্যা প্রমাণ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আধুনিক অনেকগুলি পণ্ডিত বর্গের যুক্তি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবৎ ১৩০০ শতাব্দীতে রচিত স্বীকার করেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে বৈদ্যবংশজ বোপদেব ভাগবৎ প্রণেতা। স্যার হরি সিং গৌর মহাশয় তাঁহার প্রণীত The Spirit of Buddhism নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে

লিখিয়াছেন যে, ভাগবৎ পুরাণ খৃঃ ১২০০ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে।*

পদ্ম পুরাণ। পদ্ম পুরাণ রামানুজের পরসাময়িক। পণ্ডিত অক্ষয় কুমার দত্তের মতে, ঐ গ্রন্থে রামানুজের কথা থাকায় উহা রামানুজের পরসাময়িক। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই পুরাণ দ্বাদশ শতাব্দীতেই রচিত। কেননা রামানুজ খৃষ্টীয় ১১০৪ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন এবং ১১৫৫ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করেন।

বিষ্ণু পুরাণ। এই পুরাণখানি উইল্‌সন্ সাহেব ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিরচিত। নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ এবং ভারতীয় দুই চারিটী স্থান এবং রাজার নাম দেখিয়া উহা দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া বুঝা যায়। বঙ্কিমবাবু বলেন, "এই গুপ্ত রাজাদের নাম বিষ্ণু পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ের রচনা।" বঙ্কিম বাবুর সাধু ইচ্ছা বটে, তবে "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া কাটান দেওয়াটা এদেশের একটা রোগ। ফলতঃ, কৃষ্ণচরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ হইলে, ইহাই বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা মাত্র।

ব্রহ্ম পুরাণ। উইল্‌সন্ সাহেব এই পুরাণ খানি ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়াছেন। আমরা

---

* The Spirit of Buddhism pp. 7.

স্পষ্ট দেখিতে পাই, বিষ্ণু পুরাণের কৃষ্ণ চরিতের ২৮শটী অধ্যায় এই পুরাণে অবিকল অনুলিপি করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দুইটী বিষয় সপ্রমাণ হয়। (১ম), ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণু পুরানের পরে রচিত। (২য়), কৃষ্ণকে অবতার করিবার জন্যই পুরাণকারদিগের ঐকান্তিক চেষ্টা। বস্তুতঃ, স্থিরচিত্তে বিচার করিলে জানা যাইবে, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার প্রমাণ করাই পুরাণ সমূহের বহ্বাড়ম্বরের মূল কারণ।

অগ্নি পুরাণ ঃ অত্যন্ত অভিনব গ্রন্থ। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, "উহাতে একটী গীতা প্রকরণ থাকায়, উহা গীতার পরসময়বর্ত্তী, তাহাতে সংশয় নাই।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ঃ অত্যন্ত আধুনিক রচনা। বোধ হয়, চৈতন্য শিষ্যগণের রচনা। ভাষা বাঙ্গালা সাধুভাষার মত সহজ। এই পুরাণ হইতেই কৃষ্ণের সঙ্গে "রাধিকা" (রাধা) গোপিনীর পরিচয়। মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, এমন কি ভাগবতেও রাধা ছিল না। হঠাৎ রাধা প্রেমের ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে হয়, রাধাবল্লভীদলের কোন সটীকী রসিক নাগর ইহার জন্মদাতা। উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন, বোধ হয়, এই নামধেয় যে আসল পুরাণ ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে। আমার মনে হয়, রাধাবল্লভীরা তাহা নষ্ট করিয়া, এই নূতনটী দ্বারা অষ্টাদশের ঘর পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ঃ অতীব আধুনিক রচনা। ইহাতেও রাধাপ্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে এবং কেহ কেহ এই পুরাণ

খানিতে "রাধা হৃদয়" বলিয়া একটী বিশেষণ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। অন্য পুরাণগুলির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আলোচনা উইল্‌সন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যাইবে। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা কেহই পুরাণ গুলির নামোল্লেখ করেন নাই। ইহাতে জানা যায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারত ছিল, কিন্তু কোন পুরাণ বর্ত্তমান ছিল না। বঙ্কিমবাবু মেঘদূতের "গোপবেশস্য বিষ্ণো" ধরিয়া যে অদ্ভুত কষ্ট-কল্পনার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আদৌ মূল্যবান নহে। বস্তুতঃ, উহা দ্বারা পুরাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হিন্দু পণ্ডিতগণ, পুরাণ সমূহের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন, কোথাও বা পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে দেখিতেছেন এবং এই সকল শঠতা জানিতেছেন, অথচ অদ্যাপি সেই সকল শাস্ত্রের পোষকতা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। ইহাই ভ্রান্তি এবং ধর্ম্মহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ, ইহাদেরই সম্বন্ধে খৃষ্ট বলিয়াছেন, "কেননা এই লোকদের হৃদয় অসাড় হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারি (বধির) হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে আর কর্ণে শুনে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে (ইং Converted অর্থাৎ পরিবর্ত্তিত হয়), আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।" মথি, ১৩ ; ১৫।

আমি অনুমান করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বিষয় আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্ব সংস্কারবিহীন, পক্ষপাত শূন্য, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই এখন সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশকৃষ্ট জীবনীর আভাষ মাত্র লইয়াই পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ অবতার রচনা হইয়াছে। আমেরিকার ইয়েল কলেজের প্রফেসর হপকিনস্ সাহেব বলেন, "গীতা মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ঐ গীতা আবার খৃষ্টীয় শিক্ষায় সজ্জিত। ইহা দেখিয়া মনে হয়, যখন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম অধিকার বিস্তার করে, তখন মহাভারতের কৃষ্ণ যোদ্ধাকে হিন্দুরা ভগবানের অবতার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা আমি অনুমান করিয়া বলিতেছি না, ইহা অকাট্য ইতিহাস।"

"So decided is the alteration and so direct is the connection between this latter phase of Krishnaism and Christianity, that it is no expression of extravagant fancy, but a sober historical fact, that Hindus of this Cult have, though unwittingly, been worshipping the Christ child for fully a thousand years. *Apostles of India.*

এ স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ যে সময়টীকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল বলিয়া লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কদাচ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইতে পারে না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Historical View of Hindu

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Astronomy নামক পুস্তকে, বেণ্টলী (Bentley) সাহেব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পত্র লইয়া অখণ্ডনীয় রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ৬০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ৭ই তারিখে হইয়াছিল। আচার্য্য John Stewart M. A., Ph. D. মহাশয় তাঁহার লিখিত Nestorian Missionary Enterprise নামক গ্রন্থে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, এবং G. R. Kay মহাশয়ও তাঁহার Hindu Astronomy নামক প্রবন্ধ, যাহা No. 18 Memoirs of the Archaeological Survey of India (A. D. 1914) রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ প্রকার অভিমত ও যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৬২৯ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং (Huen Tsiang) ভারতবর্ষ দর্শনাভিলাষে দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের যে সকল দেবদেবী বা উপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী কথাও নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, সে সময়ে ভারতে কৃষ্ণকথা প্রচার হয় নাই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই।

বস্তুতঃ, কৃষ্ণকে বাঁচাইবার জন্য কেহ কেহ নানাবিধ কুতর্ক উপস্থিত করিবেন, নানাবিধ চাতুরি ও প্রবঞ্চনার চেষ্টাও করিবেন, তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে, যে ব্যক্তি

প্রতারণার চেষ্টা করিবেন, তিনি নিজেই প্রতারিত হইবেন। ঈশকৃষ্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, "সেই প্রস্তরের (কৃষ্টের) উপরে যে ব্যক্তি পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু সেই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে সে চুরমার হইয়া গুঁড়াইয়া যাইবে।" মথি, ২১ ; ৪৪ পদ।

পঞ্চম অধ্যায়।

গীতা।

সাহিত্যের ক্রমোন্নতির কাল নির্ণয় করিবার প্রথা অনুসারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, গীতা আধুনিক রচনা। মহাভারতে উহা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং উহার উদ্দেশ্যের সহিত মহাভারতের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আছে, ইত্যাদি। এদেশের পণ্ডিতগণ, কোন কোন মতে অনৈক্য দেখাইলেও, "গীতা মহাভারতের অংশ নহে", এই সত্য কথা সকলেই এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দো, সাহিত্য রথী বঙ্কিম চট্টো, পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজা রামকৃষ্ণ ভাগবৎ, যোগীন্দ্রনাথ মুখো, এস এন ঠাকুর, ঐ দলের লোক। ভারতের কোন ইতিহাস না থাকায়, কাল

নির্ণয় বিষয়ে, কেহ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী, কেহ পঞ্চম, কেহ বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গীতা রচিত বলিয়াছেন। বিচারপতি তৈলঙ্গ ইহা খৃষ্টের পূর্ব্বে রচিত বলিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, গীতা সপ্তম শতাব্দীর শেষে রচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ হঠাৎ এই কথা স্বীকার করিবেন না বলিয়া, নিম্নে তাঁহাদিগকে কতকগুলি যুক্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

১ম। গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইবার পরে লোকে সূচীপত্র করিয়া গ্রন্থে যোজনা করে, ইহা সাধারণ নিয়ম। মহাভারত রচনা সমাপ্ত হইবার পরে অবশ্য উপক্রমণিকা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। কেননা মূল মহাভারতে ৮৮০০ শ্লোক মাত্র ছিল, উপক্রমণিকা প্রভৃতি লইয়া তৃতীয় অবস্থায় উহাতে ২৪০০০ শ্লোক হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ উপক্রমণিকায় গীতার কথা উল্লেখ নাই। সুতরাং স্বীকার্য্য যে, উপক্রমণিকা রচনার কালে গীতা ছিল না। থাকিলে, উপক্রমণিকা মধ্যে উহার উল্লেখ থাকিত।

২য়। তৃতীয় অবস্থায় মহাভারতে ২৪০০০ শ্লোক ছিল মাত্র। এখন দেখা যায় উহাতে ১২০০০০ শ্লোক সংগ্রহ হইয়াছে। সুতরাং যাবতীয় নূতন ধরণের উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অংশগুলি মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া জানা যায়। ঐ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় গীতা রচিত। অতএব উহা অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত স্বীকার করিতে হইতেছে।

৩য়। বৈদিক কালে রূঢ় ভাষায় প্রাচীন উপনিষদ সমূহ রচিত। কিন্তু অথর্ব্ব বেদের উপনিষদ সমূহ আধুনিক। গীতায় অথর্ব্বে ব্যবহৃত বহুতর পদ ও ভাব নিবিষ্ট থাকায়, উহা অথর্ব্বানের পরে রচিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। অধিক কি, দর্শন শাস্ত্র রচিত হইবারও পরে গীতা রচিত। কেননা গীতাতে বেদান্তের আভাষ আছে, এবং কপিলের প্রতি ভ্রূকুটি আছে। সুতরাং গীতা রচনা দর্শন শাস্ত্রেরও পরসাময়িক।

৪র্থ। গীতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা উক্ত থাকায়, মনু, যাজ্ঞবল্ক, নারদ, প্রভৃতি, সংহিতার পরে উহা রচিত হইয়াছে, এমন বুঝা যায়।

৫ম। গীতায় বহুল নূতন শব্দ প্রযোজিত হইয়াছে। ঐ সকল শব্দ পুরাণের পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। এমন কি, গীতা, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, প্রভৃতিরও পরসাময়িক। গীতাতে নিহিত শব্দ বিন্যাস ও অভিনব ভাব প্রকাশ দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন লেখকই গীতার নামোল্লেখ করেন নাই। কেহই গীতা প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের অভিব্যক্তি করেন নাই দেখিয়া, উহা ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছে তাহাতে সংশয় থাকিতেছে না।

৬ষ্ঠ। যে বেদব্যাস মহাভারতে কৃষ্ণকে সারথি, মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রতারক সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাহাকে ভগবানের অবতার করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণ

অসঙ্গত। ভারতে সারথি অথচ গীতায় কৃষ্ণ অবতার! বাস্তবিক; "মন্দার মালার" সম্পাদকের লিখিত কথাগুলি অতীব সত্য। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "কুরুক্ষেত্রে ঘোড়া ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে, শ্রীকৃষ্ণ নীতিশিক্ষা দেন নাই।" প্রকৃতপক্ষে, গীতা কৃষ্ণের উপদেশ নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থ—The Religious Quest of India, Indian Theism from the Vedic to the Mohamedan Period—দ্বয়ের প্রণেতা, নিকল ম্যাকনিকল (Nicol MacNicol, M.A., D.Lit.) মহোদয়, তাঁহারই লিখিত Historical Table—ঐতিহাসিক সূচীপত্রে, স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতগীতার আভ্যন্তরিণ ও আনুসঙ্গিক অবস্থা দুই ভাগে— অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্দীয় ভাগে—বিভক্ত, এবং প্রত্যেকটীর সময় বিভিন্ন, যথা,—

(১) রামায়ণ, ৪০০ হইতে ২০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।
(২) মহাভারত, ৪০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪০০ খৃঃ পশ্চাব্দ।
(৩) ভাগবদ্গীতা, ১০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০ খৃঃ পশ্চাব্দ।

পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে কেবল ইনিই গীতাকে একটু প্রাচীনত্ব প্রদান করিয়াছেন দেখা যায়, তথাপি ইনিও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টের পূর্ব্বে রচিত বলিতে পারেন নাই। ইহার মতে ইহার কিয়দংশ খৃষ্টের অনতিকাল পূর্ব্বে এবং কিয়দংশ খৃষ্টের পরে লিখিত। সে যাহা হউক, ইনি

বেশ স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল, অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্বে যে রূপ ছিল খৃষ্ট পরে তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থগুলি একেবারে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্বে উহাদিগেতে যে সকল বিষয় ছিল তদ্ভিন্ন বহু বিষয় ক্রমবর্দ্ধনের রীতি অনুসারে সংযোজিত হইয়া উহাদের কলেবর যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার কবিয়া থাকেন। এমন কি, স্যার হরি সিংহ গৌর মহাশয়ও তাঁহার "Spirit of Budhism" নামক পুস্তকে স্পষ্টরূপে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন, ইহাও দেখিতে হইবে যে, পুরাতন বৌদ্ধ লেখকেরা কেহই গীতা বা শ্রীকৃষ্ণের কোনই উল্লেখ করেন নাই, এবং তৎকালবর্ত্তী বৌদ্ধ ধর্ম্মের অথবা অন্য কোন সাহিত্যে ইহাদের আভাষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। Arthur A. Mac Donell M.A., Ph. D., যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচিত A History of the Sanskrit Literature নামক পুস্তকে Megasthenes of India নিবন্ধে, ৪১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—Krishana would also seem to have been regarded as an Avatar of Vishnu, though it is to be noted that Krishna is not yet mentioned in the old Buddhist Sutras"—

অর্থাৎ, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, হয় ত কৃষ্ণ এই সময়ে বিষ্ণুর অবতার বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এখন পর্য্যন্ত কোন পুরাতন বৌদ্ধ সূত্রে কৃষ্ণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক, পুরাতন কোন লেখকই শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা গীতার কোন উল্লেখ করেন নাই, অথচ বিচারপতি তৈলঙ্গ মহাশয় যে কি করিয়া বলেন, গীতা খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল এবং এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইতিহাস লেখকের পক্ষে ঘটনা সমূহের কালবিশেষ নিরূপণ করাই প্রধান কার্য্য। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস কিছুই নাই, এবং কাল নির্ণয়ের উপাদানও অতি সামান্যই আছে, এমন কি, কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ, বৈদান্তিকগণের কাল নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন, কারণ ইঁহাদের মধ্যে অনেকরই জীবনী নাই, যদিও বা কাহারও আছে তাহা অতিশয় আবর্জ্জনা পূর্ণ এবং ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্যযোগ্য নহে; আবার অনেকেই সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনের ইতিহাস পাওয়া কোন দেশে কোন কালেই সহজসাধ্য নহে, তদুপরি আবার এদেশে জীবনী বা ইতিহাস লেখার প্রথা পূর্ব্বে কখন ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে, সূত্রের রচয়িতা বেদব্যাসের কাল ও ব্যক্তিত্ব লইয়া সঠিক কোন ইতিহাস বিরচিত হয় নাই এবং ইহা লইয়া অদ্যাপি নানারূপ মতভেদ

আছে ও তন্মধ্যে কোনটী ঠিক তাহা বুঝা দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ কাল ৩১০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে, আবার কোন কোন জ্যোতিষীর মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ২৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব বৎসর। সে যে অব্দেই হউক না কেন, এখন দেখিবার বিষয় এই যে, খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল কি না এবং যদি থাকিত তাহা হইলে তাহার অবস্থাই বা কিরূপ ছিল। তখন তাহার মধ্যে কি বস্তু ছিল এবং কতটুকু ছিল তাহা অদ্যাপি কেহই সঠিক বর্ণনা করিতে সক্ষম হন নাই, এমন কি, পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও নানা দিকের নানা ইতিহাসাদি সংগ্রহ করিয়া এ বিষয় পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদ্যপি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সমসাময়িক এবং মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ২৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব বৎসরেই সংঘটিত হইয়াছিল. তাহাতেই বা কি আসে যায়? প্রক্ষিপ্ত অংশকে কি কখন ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে? আর গীতা যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে তাহাও ত বলিতে পারা যায় না!

প্রক্ষিপ্তবাদ লইয়া বিচার করিতে হইবে, এবং ইহাই এ স্থলে বিচারের মূল বিষয়। গীতায় প্রক্ষিপ্ত অংশ নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? ৭০টী মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে।* অতএব ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শুধু যে

---

* শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ইহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। পরলোকগত শঙ্করনাথ পণ্ডিত মহাশয়

গীতা মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে, এই গীতাতেও কালক্রমে যথেষ্ট প্রক্ষেপ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়, তাঁহার "কৃষ্ণ এবং গীতা" নামক ইংরাজি গ্রন্থে ইহা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমানে সুধীমণ্ডলী বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বেশ সুন্দর হইয়াছে।

এদেশেব লেখকগণ প্রায়ই কাল পিছাইয়া লইয়া যাওয়া রূপ ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া পড়েন—অবশ্য দেশের পূর্ব্ব গরিমা সমর্থনেব আগ্রহেই—কিন্তু বস্তু বিষয়ে ধরা পড়িলে তখন আর সামলাইতে পারেন না! পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও স্থানে স্থানে এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় নাম ও লেখনীর প্রভাবে ঘোষনা করিয়া দিলেন যে, ভারতের, কেবল বেদান্তদর্শন নহে, কিন্তু অন্যান্য সকল দর্শনই মহাভারতের সমকালে শৃঙ্খলার সহিত সূত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এ কথা বলিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, সাংখ্যসূত্র চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অন্তে

যবদ্বীপ হইতে আনীত একখানি অতি প্রাচীন গীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ করি, অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সন্তানগণের নিকট তাহা এখনও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহাতে মাত্র ৭২টি শ্লোক আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের মতে ইহাই গীতার আদি ও অবিকৃত অবস্থা।

অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরচিত হইয়াছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলার (Maxmuller) বলেন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এবং ম্যাকডোনেল (MacDonell) সাহেব বলেন ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে সাংখ্য সূত্র লিখিত হইয়াছে। সরস্বতী মহাশয় এই মত খণ্ডনার্থে অথবা ইহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বা তর্ক উপস্থিত করেন নাই। সে যাহা হউক, গীতা সম্বন্ধেও তাঁহার মত যে অভ্রান্ত তাহাও বলা যাইতে পারে না। তিনি গীতাকে আদৌ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তথাপি তাহা প্রমাণার্থে কোন যুক্তি তর্কও প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার মত এখন আর সুধী সমাজে সমাদৃত নহে। এদেশীয় লেখকগণের ইহা সম্বন্ধে যে অভিমত তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে কতক অংশে প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে বাহুল্য জ্ঞানে সে সকল আর অধিক উদ্ধৃত না করিয়া কেবল সুবিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত গার্ব্বে সাহেবের মতের অনুবাদ করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি ছয় সাত বার গীতা অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গীতা অংশ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

গীতা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতেই চিত্রিত কৃষ্ণ চরিত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায়? ইহার পর, পুরাণ ও উপপুরাণাদি ত স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা। ফলতঃ, কৃষ্ণ উপাখ্যান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলে সর্ব্ববিষয়ে একমত নহেন এবং কে কখন কোন পথ অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক

আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ। এই সকল কারণেই পরলোকগত শঙ্করনাথ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার লিখিত 'পুরাণ ও ব্যাসদেব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আধুনিক অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ গুলি মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে এবং এইগুলি বাস্তবিক আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। এই মত সমর্থন করিয়া "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন" নামক পুস্তকে, বেদান্তবাগীশোপাধিক অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বিদ্যাভূষণ, তত্ত্ববারিধী, মহাশয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, "কৃষ্ণ তত্ত্ব" আখ্যানভাগে, যে সকল প্রবল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন তাহা যথার্থ এবং বর্ত্তমানে সুধীমণ্ডলীর গ্রাহ্যযোগ্য ও আদরণীয় হইয়াছে।

উত্তর-গীতা মহাভারতের অংশ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু অনেক মহাভারত মধ্যে এই অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি তাহা অদ্যাবধি ভারতীয় কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, এই অংশ মহাভারতে সময় ও প্রয়োজন মত সংযোগ করা হইয়াছে, এবং ফলতঃ ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, ক্রমে ক্রমে পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। "এই উত্তর-গীতাখানি তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং অর্জ্জুন শ্রোতা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে যোগারূঢ় এবং আরুরুক্ষের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে জীব "ও ব্রহ্মের ঐক্য সমর্থিত হইয়াছে।" মহাভারতের এই অংশে যে প্রচুর প্রক্ষেপ কার্য্যের পরিচয়

পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করা বা লঘুভাবে উড়াইয়া দেওয়া সমীচীনতার পরিচায়ক নহে।

আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবন, শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্র যে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনি গীতা, উপনিষদ, প্রভৃতি শাস্ত্রের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য; তবে কোন সময়ে কোন গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁহার সকল ব্যাখ্যাই যে, সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্যযোগ্য হইয়াছে এমত নহে। স্থলে স্থলে দার্শনিক মতে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে এবং মতেরও প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। সে যাহা হউক, যদি ধরা যায় যে, ষোড়শ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কৃত সমস্ত ভাষ্যাদি সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ না হইয়া বরং পশ্চাব্দই সপ্রমাণিত হয়। Sacred Books of the East নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অষ্টম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায়, ভূমিকার পাদটীকায় এই প্রমাণ সন্নিহিত আছে, যথা :—"Professor Tiele (History of Ancient Religions, page 140) says, Sankara was born in 788 A.D., on the authority, I presume, of the Aryavidyasudhakara (P. 226)". উক্ত আচার্য্যের আবির্ভাবকাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ ধরিলে, শঙ্করাচার্য্য যে ষোড়শ বৎসরের মধ্যেই গ্রন্থাদির টীকা সমূহ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা সঙ্গত হয়। Sanskrit Literature নামক গ্রন্থের প্রণেতা, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল

(Macdonell) মহোদয়, উক্ত পুস্তকের ৪০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"The famous Vedantist Philosopher Sankara, whose name is intimately connected with the revival of Brahmanism, was born in 788 A.D., became an ascetic in 820", আবার ঐ গ্রন্থেরই অন্য এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—"The great Vedantist Philosopher Sankaracharya, who wrote his commentary in 804 A. D., often quotes the Mahabharata as a Smriti, and in discussing a verse from Book XII expressly states, that the Mahabharata was intended for the religious instruction of those classes, who by their position, are debarred from studying the Vedas and the Vedanta." প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও লেখক Mr. R. G. Bhandarkar মহাশয় বলেন যে শঙ্করাচার্য্য পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় শঙ্করের জন্মকাল খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রমাণ করিতে গিয়া বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি ত সময়টা যথেষ্ট পিছাইয়া দিয়াছেন, তার পর, কেরলের (মালাবর) পণ্ডিতদিগের প্রবল যুক্তির নিকট তাঁহাকে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। কেরলের পণ্ডিতগণ আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে সকল প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়া উপসংহার করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় সকল পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে আচার্য্যের জন্ম সময়

খৃষ্ট জন্মের বহু কাল পরে হয়। ৪৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, কেহই প্রবল যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বরং দেখা যায় যে, আধুনিক লেখকগণ প্রায়ই কেরল পণ্ডিতগণের মতানুবর্ত্তী মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেরল পণ্ডিতগণের সাতটী যুক্তিই প্রবল ও অখণ্ডনীয় ভাবে সজ্জিত। সেগুলি পাঠ করিলে শঙ্করের জন্ম যে খৃষ্ট পূর্ব্বে নহে কিন্তু খৃষ্ট শকাব্দেই ঘটিয়াছিল, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। এবং ইহা স্বীকার করিলে শঙ্করের গীতা ভাষ্য যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে লিখিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে বাধা জন্মে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ইতিপূর্ব্বেই—অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই—ভারতে পূণ্যাত্মা থোমা (St Thomas) দ্বারা খৃষ্ট সুসমাচার প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই কালটী নির্ণয় করিয়াই পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিতে পারিয়াছেন যে, গীতার সহিত সুসমাচারের বেশ সুন্দর একটী সামঞ্জস্য বিরাজ করিতেছে, এবং তাহা কেবল এদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার ফলেই ঘটিয়াছে। বাস্তবিক, গীতা যে খৃষ্টের শিক্ষার ফলেই প্রভাবিত হইয়া রচিত এবং খৃষ্টশিক্ষায় সজ্জিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিষয়ে এস্থলে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এতদসম্বন্ধে আরও অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে নিম্ন লিখিত পুস্তক

গুলি পাঠ করিবেন। (১) Doctor Howell মহোদয় প্রণীত Soul of India নামক গ্রন্থের ৫২৯ পৃষ্ঠায় Parallels between the Gospel of St. John and the Gita নিবন্ধ, (২) A. Lillie কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তক Buddhism in Christendom নামক পুস্তকের ২৩অধ্যায়ে Krishna Avatar এবং ২৭ অধ্যায়ে The Legend of the Five Sons of Pandu নিবন্ধদ্বয় এবং (৩) Sir Monier Williams M.A., D.C.L. মহাশয়ের লিখিত পুস্তক Indian Wisdom.

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারক এবং লেখকগণ কেবল খৃষ্ট মাহাত্ম্য বিবৃত করিবার অভিপ্রায়েই এই সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক প্রকাশিত প্রমাণ সমূহ অবগত হইয়াও এরূপ কথা বলা বুদ্ধিমানের সাজে না। সত্য কখন অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। ধীর ও নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে সত্য অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কাল নিরূপণ প্রথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তথাপি তিনি নির্ভিকচিত্তে বলিতে পারিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশের ব্রাহ্মমত ও থিওসফিষ্ট মত, এবং পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজের মত, খৃষ্টান প্রভাবের ফল বলিয়া প্রতীত হয়।" ইহা দ্বারা তিনি কোনও রূপ অসূয়া-পরবশ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় না বরং তাঁহার সত্যপ্রচার রূপ সদুদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। ফল কথা, গীতা যে যীশু খৃষ্টের শিক্ষার ফলে উদ্ভাবিত হইয়া লিখিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই এবং

ইহা যে তাঁহার তিরোভাবের বহুবৎসর পরে, এমন কি ভারতে সুসমাচার প্রচার এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় গঠিত হইবারও অনেক পরে লিখিত হইয়া মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছে তাহাও অকাট্য সত্য।

এদেশে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সে ধারা যুগে যুগে কেবল বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং এখনও তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। কৃষ্ণের জীবনী যদি লেখকগণের দ্বারা প্রতি যুগেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই ইতিহাস-ধারার মূলে যে কৃষ্ণ আছেন তিনি যে অবতার নহেন তাহাই এস্থলে প্রমাণ করিয়া দিতেছি। "ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এক দেবকী পুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। তিনি অঙ্গিরস ঘোর ঋষির নিকটে ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৭।৬। এই ঘোরশিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বাসুদেব কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষৎ সঙ্কলন সময়েও শ্রীকৃষ্ণ অবতার পদবীতে উন্নীত হয়েন নাই। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যের ভাষ্যে ইঁহাকে বাসুদেব কৃষ্ণ বলেন নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলারও এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া এ দেশের লোকের যে সাধারণ একটা বিশ্বাস আছে তাহা ইতিহাস মূলক নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার তাই গীতাতে কৃষ্ণের উক্তি ভগবদুক্তি রূপে বর্ণিত হইয়াছে—এ বিশ্বাস বেদ বিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্থ

উপদেষ্টা, স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং এস্থলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণের সহিত মহাভারতের কৃষ্ণ বা গীতার কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই।

আবার গীতার কৃষ্ণের সহিত পুরাণোক্ত কৃষ্ণের কোনই ঐক্য স্থানাধিকার করে নাই। অনুগীতাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্জ্জুন যখন পুনরায় গীতোক্ত তত্ত্ব কৃষ্ণের মুখে শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন—"যোগাস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন?" বাক্য ইহা অপেক্ষা আর সংশয়চ্ছেদিত হইতে পারে না। গীতা দ্বারা কৃষ্ণ একজন সাধক ছাড়া আর কিছুই প্রমাণিত হন না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সকলেই একযোগে একই কথা বলিতেছে। সুতরাং "গীতা ভগবদুক্তি, ইহার উপর বিচার চলে না" বলিয়া যাঁহারা তর্ক উত্থাপন করেন তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। অধ্যাপক ধীরেন বাবু, তাঁহার পুস্তকে, "কৃষ্ণতত্ত্ব গীতার অভিমত" নিবন্ধে, ১৩৯ পৃষ্ঠায় যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন আমিও তাহার সমর্থন করি। সে ব্যাখা যথার্থ ও সর্ব্ববাদী সম্মত।

ফলকথা, মন্দারমালার সম্পাদকের কথাই ঠিক, সত্যই গীতার দোষ গুণের ভাগী গোপালনন্দন পদ্মনাভ ঋষি।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা"।

অর্থাৎ গীতা তত্ত্বামৃত স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্মবিনিঃসৃত, এই জন্য ইহার এত মাহাত্ম্য। মন্দারমালা, অগ্রহায়ণ ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা, "ভাগবদগীতার সমালোচনা" দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জীবনাখ্যা।

এদেশের শ্রীকৃষ্ণসেবকগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমি পূর্ব্বলিখিত পাঁচটী অধ্যায়ে একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ নামে পূজিত দেবতা ভগবান ঈশকৃষ্ট ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। তথাপি সন্দিগ্ধ চিত্ত সাধুগণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমি বিস্তৃত ভাবে খৃষ্ট জীবনের ঘটনাবলি সমালোচনা করিয়া দেখাইব শ্রীকৃষ্ণই খৃষ্ট। সুতরাং ঈশকৃষ্টের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তিরোভাব পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে হইল।

কাল-নির্ণয়।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে কলিকাল নির্ণয় এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া, বোপদেব লিখিয়াছেন,—"কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বর্ষ এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ প্রত্যেকে একশত বৎসর। যুগের আরম্ভের নাম সন্ধ্যা এবং অন্তের নাম সন্ধ্যাংশ। উহা শত সংখ্যক বৎসরে পরিমিত।" বোপদেবের এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর বার শত বর্ষ মাত্র অতীত হইয়াছে। এই কাল নির্ণয় প্রকৃত সত্য কথা ধরিয়া লইলে দেখা যায়, যীশু খৃষ্ট স্বর্গারোহণ করিবার

ঠিক্ বার শত-বর্ষ পরে ভাগবত লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জানা যাইতেছে, বোপদেব শ্রীঈশ খৃষ্টকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতেন।

কেবল তাহাই নহে, বোপদেবের সময়ে ঈশকৃষ্টের কোন জীবন চরিত ছিল এবং সেই জীবনচরিতের নাম "ঈশানুকথা" ছিল, তিনি এমন কথা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে শুকদেব বলিতেছেন,—"ভগবানেব অবতার কথন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী পুরুষদিগেব সৎকথার নাম ঈশানুকথা।" সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "ঈশানুকথা" নামক কোন গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল এবং বোপদেব তাহা জানিতেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত "মশীহ্-নব-জীবনী" নামক একখানি হিন্দি সুসমাচার গ্রন্থ (ঈশকৃষ্টের জীবনী) এ দেশে ছিল এবং বঙ্গদেশের অধিকাংশ যুগীকুল তৎকালে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

১। জন্ম।

"মরিয়ম্ যোশেফের স্ত্রী হইবেন বাগ্দত্তা হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, পবিত্র আত্মা হইতে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে।" মথি ১; ১৮। সুতরাং এই গর্ভ ধাতু সম্বন্ধ হীন (Immaculate) বলিয়া খৃষ্টীয়ানদিগের ধারণা। ভাগবতে লেখা আছে, "জীব সকলের ন্যায় দেবকীর ধাতু সম্বন্ধ হয় নাই। শুদ্ধ সত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদ দীক্ষা

দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিলেন।” ভা ১০ স্ক, ২ অ.। সুতরাং পুরুষের বীর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাজেই সাহস করিয়া বলিতেছি, ঈশকৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্তের অনুকরণেই শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ঘটনা রচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মনুষ্যের ঔরষ জাত মনুষ্য যেমন পিতৃ আকৃতির প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পিতৃরোগ, পিতৃস্বভাব প্রভৃতিও পাইতে পারে বলিয়া, ঈশকৃষ্ট অভিনব সৃষ্টি রীতিতে গর্ভস্থ হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, দেবস্বভাব অসম্ভব হইত। হিন্দু পুরাণকারগণ বোধ হয়, সেইজন্য দেবকীর গর্ভ সঞ্চার বিনা পুরুষ সংসর্গে হইয়াছিল, লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২। সূতিকা-গৃহ।

ভগবান শ্রীঈশকৃষ্ট পশু শালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় স্থানাভাব হেতু তাঁহার মাতা তাঁহাকে দাম বেষ্টন করিয়া, গরুকে যাব দিবার যে কাষ্ঠের উদূখল সেই স্থানে ছিল, তন্মধ্যে তাঁহাকে শায়িত রাখেন। লূক ২ ; ৭। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসের কারাগারে হইয়াছিল। কিন্তু নন্দ গৃহে তাঁহাকে বারম্বার গোশালাতে দেখা যায়। শকট ভঙ্গ গোশালাতে শায়িত অবস্থাতেই করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলরাম গোশালায় গোময় মাখিয়া, গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া খেলা করিতে ছিলেন। তথা হইতে যশোদা কৃষ্ণকে ধরিয়া আনিয়া উদরে দাম (বস্ত্র) বাঁধিয়া উদূখলে সংবদ্ধ করিলেন, বিষ্ণু পুরাণে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। সুতরাং গোশালায় থাকা

এবং তৎকালীন দামোদর নাম হওয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের ছায়া মাত্র স্বীকার করিতে হইতেছে। ঐ গোশালায় ঈশকৃষ্ট যখন শায়িত ছিলেন, সেই সময়েই স্বর্গদূতগণ আকাশ পথে মহা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাখালদিগকে প্রভুর জন্ম কথা জ্ঞাত করেন। রাখালগণ দলবদ্ধ হইয়া তথায় আসিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাহারা শিশুটীকে বন্দনা করে। লুক ২, ১৬-১৭। শ্রীকৃষ্ণ জন্মে আকাশ পথে দেবগণ আনন্দ এবং পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ, গোকুলের রাখালগণ এবং সেই সকল গোপী নন্দগৃহে উপনীত হইয়া "চিরজীবি হও" বলিয়া বালকের প্রতি আশীষ প্রয়োগ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে অবতীর্ণ হওয়াতে নিখিল গোপের আনন্দের সীমা রহিল না। ভাঃ ১০ স্ক; ৫ অ।

ঈশকৃষ্টের জন্ম হইলে পর, পূর্ব্ব দেশ হইতে কয়েকজন মাগী (বিদ্বান) আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন। মথি ২; ১১। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে পর, সূত, মাগধ (বিদ্বান) গণ আসিয়া সূতিকা গৃহে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। ভাঃ ১০ স্ক, ১ অ।

৩। জন্ম-নক্ষত্র।

ঈশ কৃষ্টের জন্মদিনে একটী অভিনব তারকা উদিত হইয়াছিল। ঐ তারকা দেখিয়াই মাগধীগণ ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। মথি ২, ২। ভাগবতে লেখা আছে, কৃষ্ণ জন্মে রোহিণী নক্ষত্র উদয় হইয়াছিল। অদ্যাপি রোহিণী নক্ষত্র ধরিয়া কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী গণনা করা হয়। এই প্রকার নক্ষত্র উদয় অন্য কোন অবতারের

জীবনে দেখান হয় নাই। হিন্দুর নক্ষত্র চক্রটী ঠিক্ যেন কৃষ্ণাষ্টমী স্থির করিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলেও এই জন্মাষ্টমী কাণ্ড যে, খ্রীষ্টানদিগের খৃষ্টমাস (বড়দিন) পর্ব্ব দেখিয়াই কল্পিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।

৪। অঙ্গপরিবর্ত্তন।

যুদাবংশীয় রীতি অনুসারে ঈশক্রষ্টের অঙ্গপরিবর্ত্তন অষ্টম দিবসে করা হইয়াছিল। লুক ২ ; ২১। এই উৎসব যিহুদীরা অদ্যাপি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইব্রীয় ভাষায় উহাকে "খখনা" এবং গ্রীক ভাষায় "পেরিটোসি" বলে। লাটীনে "সারকম্ সাইডো" (Circumcido) বলে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মেও ঐ প্রকার অঙ্গপরিবর্ত্তন উৎসব হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবং ১০ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে লিখিত আছে,—

কদাচিদৌত্থানিক কৌতুকাপ্লবে জন্মর্ক্ষ যোগে সমবেত যোষিতাং।
বাদিত্র গীত দ্বিজ মন্ত্রবাচনৈশ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী।

ব্যাখ্যা। উত্থানং শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং। তত্র করণীয় কৌতুকাপ্লবে উৎসভিষেকে তথা তস্মিন্নেব দিনে জন্মর্ক্ষস্যাপি যোগে অতি মহোৎসবে সমবেত যোষিতা মিলিত পুরস্ত্রীনাং মধ্যে বাদিত্রাদিভিঃ শোভিতং অভিষেচনং সতী যশোদা চকার।*

---

*আধুনিক প্রকাশিত অনেক ভাগবতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত সংস্করণে ইহা পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতম্। দ্বাদশ স্কন্ধাত্মকম্। মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামি কৃত ভাবার্থ দীপিকা নাম টীকা সমেতম্। ভট্টপল্লি নিবাসি শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নেন সম্পাদিতম্। সন ১৩০৯ সালে, কলিকাতা ৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের লেন, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেসে, শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে" এই উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্রীয় “খথনা” শব্দটী সংস্কৃত “উখ্থানিক” করা হইয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ইহা একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। যাঁহারা এই অনুমান ঠিক নহে বলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, জাতকর্ম্ম পদ্ধতি মধ্যে শাস্ত্রে “উত্থানিক” উৎসবের কথা উল্লেখ আছে। তৎপরে ইহাও দেখাইতে হইবে, কি কারণে এই উৎসব অন্যান্য অবতারগণের জীবনে সম্পাদিত হইল না। আর কেনই বা ইহার অর্থ অঙ্গ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে? যদি এই প্রকার উৎসব পৌরাণিক কালে আর কাহারও জীবনে সমাধা হইয়া না থাকে এবং যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ জীবনেই সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা যিহুদীয় প্রথা ত্বকচ্ছেদের নামান্তর বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হইবে। অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া যিহুদীয় প্রথা অনুসারে হুলু দিয়া, মাতা দ্বারা পুরোহিত ডাকিয়া, অঙ্গপরিবর্ত্তন কার্য্য সমাধা হয়। হিন্দুদের পুরুষেরাই সমস্ত কার্য্য করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কৃষ্ণের অঙ্গপরিবর্ত্তন ও অভিষেকে যশোদাকে ব্রতী করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যিহুদীয় প্রথার অনুকরণ মাত্র স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে।

৮। দ্বাদশ নাম বক্ষে ধারণ।

এখন ঈশকৃষ্ট যিহুদীদিগের দ্বাদশ গোষ্ঠীর মহাযাজক হইয়াছেন। তিনি যে মহাযাজক হইয়াছেন, ইব্রীয় পত্রের ৯ম অধ্যায়ের ১১ পদে লেখক তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যিহুদীয় প্রথা অনুসারে মহাযাজক নিজ বক্ষে ইশ্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর দ্বাদশ নাম বহন করিতে বাধ্য। যাত্রা পুস্তক ২৮ ; ১০

পদ দেখুন। ঈশকৃষ্ট অদ্যাপি ঐ দ্বাদশ নাম নিজ বক্ষে বহন করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিবার কথা ভাগবতে দেখা যাইতেছে। ঐ স্থানে লিখিত আছে—"বালকের স্নান করাইল, পরে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ নাম লিখিয়া দিয়া রক্ষা বিধান করিল।" শ্রীভাঃ ১০ম স্ক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যিহুদীয় প্রথা অনুসারে মহাযাজক পদে অভিষিক্ত করিতে হইলে অগ্রে স্নান করাইতে হয়। যাত্রা ৪০ ; ১২-১৬। পরে ঐ দ্বাদশ নামাঙ্কিত দুইটী মণি তাঁহার বক্ষে লাগাইয়া দিতে হয়। এই আশ্চর্য্য প্রথা আর কোথাও নাই। অথচ শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রতি সেই প্রকার স্নানান্তে দ্বাদশ নাম ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল দেখিয়া কি স্তম্ভিত হইতে হয় না? হয় ত. এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে কৌস্তভ মণির কল্পনা করা হইয়া থাকিবে।

৬ঃ গোপূজক মিশর দেশে পলায়নঃ

কংসল হেরোদ শিশুটীর প্রাণবধ করিবে জানিয়া, "যোশেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটী ও তাহার মাতাকে লইয়া মিশরে পলায়ন করিলেন।" মথি ২ ; ২৪। কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবে জানিয়া বসুদেব "রাত্রিকালে শিশুটী লইয়া বহির্গমন করিলেন। তৎকালে মেঘপটল গর্জ্জন পূর্ব্বক জলবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গমন ব্যাহত হইল না। অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার দ্বারা জল নিবারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।" ভাঃ ১০ স্ক

৪অ। কংস ভয়ে, বসুদেব রাত্রিযোগে শিশু লইয়া পলায়ন করিলেন এবং তিনি গোকুলে গেলেন, এই ঘটনাটী মথি লিখিত যোশেফের পলায়ন বৃত্তান্তের সহিত ঠিক মেলে। কেবল অনন্ত দেবের ফণাটা সুসমাচার গ্রন্থে নাই। কিন্তু ঐ প্রকার একটী বৃত্তান্ত উপসুসমাচারে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু টমাসের সুসমাচারে লিখিত আছে, "গমন কালে পথপার্শ্বস্থ যাবতীয় তরু অবনত হইয়া দেবশিশুকে ছায়া প্রদান করিতে লাগিল।" মিশর দেশের "মেটিরা" নামক ক্ষুদ্র নগরে, পলাইত যিহুদীদিগের একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশ ছিল। টমাস্ লিখিয়াছেন, ঐ স্থানের লোকেরা সকলেই পশুপালক ছিল এবং তাহারা অনেক গাভী রাখিত। পুরাণকারগণ ঐস্থানটী সেইজন্য গোকুল করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায়। শ্রীঈশকৃষ্ট ঐ স্থানে প্রচুর দুগ্ধ, "দধি, মধু খাইতেন" বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়। আবার ঐ সময়ে মিশর দেশে গোপূজা প্রচলিত ছিল এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও মিশরকে গোকুল বলিয়া অভিহিত করিবার একটী কারণ হইতে পারে।

৭। শিশু হত্যা।

কংসল হেরোদ প্রতারিত হইয়াছেন দেখিয়া, সভাসদ্গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, "দুই বৎসর ও তাহার ন্যূন বয়স্ক যত শিশু বৈৎলেহেমে ও তাহার পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে সকল বধ করাইলেন।" মথি ২ ; ২৬।

এদিকে দেখিতে পাই, "রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র কংস মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া, কন্যারূপিণী মায়ার কথিত সমস্ত

কথা তাহাদিগকে কহিলেন। তাহারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, "হে ভোজেন্দ্র! যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে পুর, গ্রাম, ব্রজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহাদের বয়স দশবর্ষের ন্যূনই হউক অথবা অধিক হউক, সকলকে বিনষ্ট করা যাউক।" ভাঃ ১০ স্ক; ৪ অ। পাঠক, এই দুইটি বৃত্তান্ত লইয়া একটু চিন্তা করুন এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করুন। তুচ্ছ ভাবে উপেক্ষা করিয়া পরকালের সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন না।

৮। অস্থুরীর দেহত্যাগ ও স্বর্গারোহণ।

অস্থুর বংশীয়া পন্থুয়েলের কন্যা "হান্না" একজন ভাববাদিনী ছিলেন। ঈশকৃষ্টকে মন্দিরে আনয়ন করা হইলে পর, তিনি আসিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। হান্না প্রভুকে কোলে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঈশকৃষ্টের দর্শন লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। লুক ২; ৩৬-৩৮। এই ঘটনাটী বিকৃত করিয়া অস্থুর বংশীয়া পূতনা করা হইয়াছে। লিখিত হইয়াছে, পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়াছিল। কৃষ্ণকে বধ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পূতনা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল। ভাঃ ১০ স্ক. ১১ অ। পৌরাণিকগণ ধার্ম্মিকা হান্নাকে যেমন বিকৃত করিয়া পূতনা রাক্ষসী করিয়াছেন, ঐরূপ অনেকগুলি সত্য বিবরণ লইয়া দানব দৈত্যের ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, একটী ঘটনা নিম্নে

প্রদর্শন করিয়া, অবশিষ্টগুলি পরিশিষ্টে ব্যাখ্যা করিব স্থির করিয়াছি।

৯। বিহঙ্গ।

ঈশকৃষ্টকে যোহন যর্দ্দন নদীতে অবগাহিত (বাপ্তাইজিত) করিলেন। তিনি স্নান করিয়া উঠিবামাত্র, স্বর্গ উদ্ঘাটিত হইল এবং পবিত্র আত্মা একটী বিহঙ্গের বেশে তাঁহার মস্তকের উপরে নামিয়া আসিল, দেখিলেন। মথি ৩ ; ১৬। ভাগবতে লিখিত হইল, শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্গ গঙ্গার জলে অভিষেক করা হইল, অধিকন্তু, বক নামক এক বিহঙ্গ, কংস প্রেরিত হইয়া, তুণ্ডাঘাত দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিল। বক যখন মুখ বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি আসিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার তুণ্ডদ্বয় ধারণ করিয়া বালকগণ সমক্ষে বীরণবৎ বিদীর্ণ করিলেন। ১০ স্ক, ১১ অ। পাঠক, আপনার নিকট ইহার কোনটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ?

১০। আত্মা কর্ত্তৃক শূন্যে বহন।

ঈশকৃষ্টকে দুরাত্মা পর্ব্বতের শিখর দেশে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। মথি ৪ ; ৮। পৌবাণিকগণ কল্পনা করিলেন, "তৃণাবর্ত্ত দানব চক্রবায়ু রূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে যদিও আকাশ অতিক্রমণ করিল, তথাপি আর যাইতে পারিল না। ভাঃ ১০ স্ক, : ৭ অ।

ইহা উপরোক্ত সত্য ঘটনাটির বিকৃত অনুকরণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

১১। দ্বাদশ রাখাল।

ঈশ কৃষ্টের বারটী শিষ্য ছিল। তিনি ইশ্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্বরূপ বারজনকে শিষ্য করিলেন। পিতর, যোহন, যাকুব, মথি, থোমা, বার্থলমিউ, ইত্যাদি। মথি ১০ ; ২-৫। পুরাণে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণেরও দ্বাদশ রাখাল সঙ্গী ছিল। তাহাদের নাম দাম, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ইত্যাদি।

ঈশকৃষ্টকে দ্বাদশ গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য বারটী শিষ্য নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ গোপাল কেন ? আর যদি লওয়াই হইল, নামগুলি ঐ প্রকার কল্পিত নাম কেন হইল ? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন নামগুলি নিতান্ত কল্পিত। রাখালগণের সংখ্যা অন্য কিছু না হইয়া দ্বাদশ হইল কেন ইহা চিন্তা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে মূল সত্যের সহিৎ বিকৃত অনুকরণের ঐক্য রাখিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

১২। অগ্রগামী বীর।

ঈশকৃষ্টের অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবার জন্য, অর্থাৎ উচ্চকে নিম্ন, নিম্নকে উচ্চ করিবার জন্য যোহন আসিয়াছিলেন। লুক ৩ : ৩-৬। তিনি তাঁহার মাতার বৃদ্ধ বয়সে জন্মগ্রহণ করেন। লুক ১ : ১৮। তিনি উষ্ট্র লোমের কম্বল পরিধান করিতেন, বনে বনে পর্য্যটন করিতেন, মধু এবং পঙ্গপাল আহার করিতেন। মথি ৩ ; ৩-৬। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রগামী সংকর্ষণ তাঁহার মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। তিনি হল দ্বারা উচ্চ ও নিম্ন সমতল করিবার

জন্য সংকর্ষণ নামে অভিহিত হন। তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিতেন এবং মধুপানে আসক্ত ছিলেন।

৯৩। কুব্জাকে ঋজু করণ।

ভগবান শাশ্বত মহাপুরুষ নারায়ণ খৃষ্ট একটী কুব্জা রমণীকে ঋজু করিয়া, তাহার ব্যাধি দূর করিলেন। ঐ নারী আজীবন তাঁহার পশ্চাদগামিনী হইয়া নিজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। লুক ১৩; ১১-১৩। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কংসের দাসী কুব্জাকে ঋজু করিলেন, লেখা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কুব্জা কৃতজ্ঞতা দেখাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত অপবিত্র ব্যবহার করিলেন। ভাঃ ১০ স্ক, ৪৬ অ।

পাঠক, এই দুইটী বৃত্তান্তের কোনটী ঈশ্বরাবতারের উপযোগী তাহা আপনারাই বিচার করুন। অপবিত্র ভাবটী অপবিত্র হৃদয়ের কল্পনা—তাহা কি স্বীকার করিবেন না?

৯৪। মৃত সঞ্জীবন।

মহাপুরুষ ঈশকৃষ্ট করুণা পরবশ হইয়া বিধবার মৃত পুত্রকে জীবন দান করিলেন। লুক ৭; ১৩। শ্রীকৃষ্ণ সান্দিপনীর মৃতপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। বিষ্ণু পুঃ ৫ অং; ২১ অ।

ভগবান ঈশ যেমন বারম্বার মৃত জীবিত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি বারম্বার মৃত জীবিত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট লাসারকে, কৃষ্ণ উগ্রসেনকে, খৃষ্ট একটী বালক এবং একটী বালিকাকে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের অনেক রাখাল বালককে পুনর্জ্জীবিত করেন।

৭৫। অন্ধকে চক্ষু দান।

যুদাবংশাবতংশ ঈশ একটী জন্মান্ধকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টি শক্তি দিলেন। যোহন ৯; ১-৭। শ্রীকৃষ্ণও করুণা প্রকাশ করিয়া. জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দৃষ্টি শক্তি দিলেন।

৭৬। কুষ্ঠরোগ আরোগ্য।

ঈশকৃষ্ট একজন কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করিলেন। মথি ৮; ৩। শ্রীকৃষ্ণও কুষ্ঠী শাম্বকে আরোগ্য করিলেন। ব্রঃ বৈ, কৃষ্ণ জন্ম, ১১৩ অ।

৭৭। বস্ত্র হরণ।

যুদাবংশীয় নারীগণ অহঙ্কারিণী হওয়ায়, ভগবান ভাববাণী দ্বারা এই কথা বলিয়াছিলেন,—

"সিয়োন কন্যাগণ অহঙ্কারিণী, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষপাত করে; লঘু পদ সঞ্চালন করিয়া চরণে রুণু রুণু শব্দ করে। এই জন্য প্রভু সিয়োন কন্যাগণের মস্তক কেশহীন করিবেন এবং তাহাদের গুহ্যদেশ অনাবৃত করিবেন। সেই দিন তিনি তাহাদের নূপুর, ঘাঘ্রা, উড়ানী, আতরের কৌটা ও বস্ত্রাদি হরণ করিবেন।" যিশা ৩; ১৬-১৮।

এই ভাববাণী যুদারমণীগণের প্রতি কখন সফল হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রে নাই। কিন্তু হিন্দু পুরাণে ঐ ব্রহ্মবাণীর ভাব লইয়া বস্ত্র হরণ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পয়ারানুবাদ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,—

নিজ নিজ বস্ত্র রাখি যমুনার কুলে
স্নান হেতু নামে সবে শীতল সলিলে।
অগুরু কস্তুরী আর নানা আভরণ
তীরে শোভে আহা মরি অতি মনোরম।
নগ্ন হয়ে যত নারী করে জল কেলি,
হেনকালে ধীরে ধীরে আসে বনমালী।
যত দ্রব্য হরি লয়, আর যে বসন—ইত্যাদি।

ভাগবতের বস্ত্র-হরণ ব্যাপার ঠিক আদিরসাত্মক নহে, এমন কথাও বলা যায়। প্রেমে এবং ভক্তিতে বাহ্য জ্ঞানের বিলোপ দেখানই ইহার উদ্দেশ্য ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ একটা গল্প রচনা কি বিনা কারণে হইতে পারে?

১৮। প্রাণ ভয়ে গিরি গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ।

ভাববাণী হইয়াছিল, "যখন ঈশ্বর পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উঠিবেন, তখন লোকেরা তাঁহার ভয়ানকত্ব হইতে ও তাঁহার প্রভাবের ভীতি হইতে, শৈলের গুহাতে ও ধূলির গর্ত্তে প্রবেশ করিবে। সেইদিনে লোকেরা পূজার্থে নির্ম্মিত রৌপ্যময় প্রতিমা এবং স্বর্ণময় দেবতা সকল ইন্দুরের ও চামচিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে। আর পৃথিবীকে বিকম্পিত করিতে উদ্যত ঈশ্বরের ভয়ানকত্ব হইতে গিরিগহ্বরে এবং শৈলের ফাটালে প্রবেশ করিবে।" যিশা ২ ; ১৯-২১।

পুরাণে লিখিত হইয়াছে, গোপেরা ইন্দ্রদেবের পূজার আয়োজন করিলে পর, কৃষ্ণ পূজা নিষেধ করিলেন। তাহাতে

কুপিত হইয়া ইন্দ্র বজ্রপাত ও বিষম বৃষ্টিপাত দ্বারা লোক সকলকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটন করিয়া ছত্রের ন্যায় ধরিলেন এবং লোকসমূহ নিজ নিজ পশুপালসহ সেই পর্ব্বত-গহ্বরে ধূলির গর্ত্তে প্রবেশ করিল। এই ঘটনাটী অতীব অতিপ্রাকৃত। তথাপি ইহা পুরাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাইবেলের ঐ ভাববাণী এখনও সিদ্ধ হয় নাই, উহা প্রভুর পুনরাগমনে সিদ্ধ হইবে। হিন্দু শাস্ত্রকর্ত্তাগণ কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম আগমনে ইহার পূর্ণতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সহজে সকলে যাহা সাধু বুঝিতে পারিতে। [illegible]

১৯। দশ সহস্র লোক বনভূমে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হয়।

শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী হরি শ্রীঈশকৃষ্ট পাঁচ খানি রুটী এবং তুইটী মৎস্য মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বনভূমে প্রায় দশ সহস্র লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। মথি ১৪ ; ১৯-২১। ঐ স্থানে লেখা আছে, বালক ও স্ত্রীলোক ব্যতীত পাঁচ সহস্র লোক ছিল। সুতরাং বালক ও স্ত্রীলোক ধরিলে প্রায় দশ সহস্র হইবে। ভারতের হরি বনভূমে বিদুরের ক্ষুদ্র অন্নকণা অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বাসার দশসহস্র শিষ্যকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন কল্পনা করা হইয়াছে।

২০। শিষ্যগণের পদ ধৌত করণ।

নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ঈশকৃষ্ট নিস্তার পর্ব্বের "ভোজ সভা হইতে উঠিয়া, উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন এবং এক খানি

গামছা লইয়া কটিবন্ধন করিলেন। পরে পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদিগের পদধৌত করিয়া দিয়া, গামছা দ্বারা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।" যোহন ১৩; ১-৯। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভামণ্ডপের পুরোভাগে ব্রাহ্মণদিগের পদধৌত করিয়া দিলেন, লিখিত হইয়াছে।

২৯। সর্পের মস্তক চূর্ণ।

মনুষ্যের একমাত্র পরিত্রাতা নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবেন, এই আপ্তবাক্য চিরকাল যিহুদীরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। এই ভাববাণী বাইবেলের পুরাতন বিধানে. আদি পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চদশ পদে আছে। এবং নূতন নিয়মে, প্রকাশিত বাক্যের দ্বাদশ অধ্যায় চতুর্থ পদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে. ঐ সর্পের সাতটী মস্তক। ঐ সর্পকে একেবারে প্রাণে বধ না করিয়া তাহার দলবল সহিত তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইল। এবং ঘোষণা করা হইল, এক্ষণে পরিত্রাণ, পরাক্রম. রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের এবং কর্তৃত্ব তাঁহার খ্রীষ্টের হইল। প্রকা। ১২; ৭-১০ পদ। এই ঘটনাটি ভাগবতে কালিয়দমনে পরিণত করা হইয়াছে। লিখিত আছে, "শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের মস্তকোপরি নৃত্য করিতে করিতে, যে যে ফণা সমুন্নত দেখিলেন, পদাঘাত দ্বারা তাহার দমন করিলেন। কালিয় অতিভারে আক্রান্ত হইয়া, মুখ ও নাসিকা বিবর দিয়া রক্ত বমন করত মোহ প্রাপ্ত হইল।" পরে "শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সর্পকে বিনষ্ট করিলেন না; বলিলেন, হে সর্প, তুমি আর

এখানে থাকিও না। বন্ধুবান্ধবসহ সাগরে গমন কর।" ভাঃ ১০ম স্কঃ, ১৬ অ।

পাঠক, বাইবেলের ঐ সর্প সয়তান, এবং খৃষ্ট মনুষ্যের পরিত্রাণ সাধন করাতে আত্মিকভাবে সেই দুরাত্মার মস্তক সমূহ চূর্ণ করা হইয়াছে। খৃষ্টীয়ানেরা কল্পনা করিয়া ইহার চিত্রপট প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, ঐ প্রকার কোন চিত্র দেখিয়া এই গল্প রচিত হইয়া থাকিবে। যমুনাতে হ্রদ নাই এবং এত বড় সর্পও নাই (পরিশিষ্ট দেখুন)। অথচ, এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা কেমন করিয়া রচিত হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বাইবেলের সর্পের মস্তকচূর্ণ বিবরণেরই ইহা অনুকরণ মাত্র বলিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে, "রাম ও কৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধে হিন্দু লেখক শ্রীবীরেশ্বর সেন মহাশয়ও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন।

২২। ধর্ম্মসংস্কার ও উপদেশ।

ঈশকৃষ্ট তাৎকালিক লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মনুষ্যকুল, আদর্শ সাধুর অভাবে, সিদ্ধপ্রকৃতি লাভ করিতে পারিত না বলিয়াই তিনি আদর্শ জীবন যাপন করিলেন। শাস্ত্রাধ্যাপকগণ প্রতারক এবং আত্মম্ভরী বলিয়া তিনি তাহাদিগের দোষ দেখাইবার জন্যই উপদেশ দিতেন। তিনিই যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত একমাত্র মুক্তিদাতা, ইহা জ্ঞাত করিবার জন্যই বলিতেন, তোমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। লুক ৯; ২৩। মার্ক ৮; ৩৪।

পুরাণে কৃষ্ণকে সেইজন্য "গীতা" প্রচারক সাজান হইয়াছে। গীতায় কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। তিনি বেদান্ত মত ও সাংখ্য মত ভ্রান্ত বলিয়াছেন। বিশেষতঃ, "সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে পাপ হইতে মুক্তি দিব," এমন কথা বলিয়াছেন। এইগুলি ঈশক্রষ্টের শিক্ষার ছায়ামাত্র। যীশু যেমন বলিলেন, "আমি এবং পিতা ঈশ্বর এক," "যে কেহ আমাকে দেখিয়াছে সে ঈশ্বরকে দেখিয়াছে", কৃষ্ণকেও তদনুযায়ী স্বয়ং ভগবান করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কথায় কথায় ঈশ্বর বুঝাইবার স্থানে 'মাং', 'মে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দেখান হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ অবতার নহেন এবং গীতা সপ্তম শতাব্দীতে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে পরলোকগত পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "মন্দারমালায়" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় চতুর্থ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"হাঁ, গীতাতে এইরূপ বিবৃতি অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নহে, অর্জ্জুনও ইহার শ্রোতা নহেন। তাঁহাদিগের এবং ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের উপরতির বহুকাল পরে পণ্ডিত গোষ্ঠি গরীয়ান মনীষী এবং মনস্বী পদ্মনাভ ঋষি ভগবদগীতার প্রণয়ণ করেন। তিনি অতীব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণকে ভগবান্ ও ভগবদবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তিনি কৃষ্ণকে বক্তা ও অর্জ্জুনকে শ্রোতা খাড়া করিয়া গীতা রচনা করিয়াছেন।"

হইতে পারে, কতেকগুলি গুপ্ত খৃষ্টীয়ানেই এদেশে ঐ প্রকারে খৃষ্ট-চরিত লইয়া সারথি কৃষ্ণের চরিত্রের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন, আর তাঁহাদেরই প্রভাবে এত কৃষ্ণভক্ত লোক দেখা দিয়াছে। ইহারা সকলেই অদূর ভবিষ্যতে ঈশকৃষ্টই সত্য অবতার বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতেন। ঈশকৃষ্টের বিরুদ্ধে কোন শক্তিই দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না।

২৩। বৃক্ষোপরি মৃত্যু।

ঈশকৃষ্ট আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, যুদাবংশীয় বিধি অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। সেকালে ফাঁসীর নিয়ম ছিল না। বৃক্ষোপরে হস্তপদে লৌহ অঙ্কুশ বিদ্ধ করিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। খৃষ্টকে ঐরূপে বিদ্ধ করিলে পর তিনি পরমাত্মাতে নিজ আত্মা অর্পণ করিলেন। প্রেঃ ক্রিঃ ৫ ; ৩০। পুরাণে এই প্রকার মৃত্যুর অনুকরণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে গাছে চড়ান হইল এবং সেইস্থানে তাঁহার চরণে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করান হইল এবং বলা হইল, তিনি যোগে জীবন ত্যাগ করিলেন। বেশ মিলিয়া গেল। বেশ ধ্বজ (চিহ্ন)+বজ্র (লৌহ)+অঙ্কুশের দাগটীও হইল। এইবার দেহটা লইয়া গোলযোগ। ঈশকৃষ্টের দেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বর্গে গিয়াছে। শাস্ত্রকর্ত্তারা জানিতেন, সেই দেহে খৃষ্ট বারম্বার দেখা দিয়াছেন। তবে কৃষ্ণের দেহটী লইয়া কি করা হইবে, এইবার তাহাই দেখিব।

২৪। মৃতদেহ স্বর্গে গেল।

শ্রীঈশের এড়ুকের কাছে দণ্ডায়মানা মাগ্দলিনী মরিয়ম রোদন করিতেছেন। এমন সময়ে, দিব্যলোক হইতে

সমাগত এক দূত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নারি, রোদন করিতেছ কেন? মরিয়ম বলিলেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে ; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানি না।" ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন। আর দেখিতে পাইলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন।" যোহন ২০ অ। এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে. প্রায় পাঁচ শত লোক জৈতুন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো এইবার কি আপনি ইশ্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন?" তিনি বলিলেন, "যে সকল সময় পিতা নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীন রাখিয়াছেন, তাহা জানিবার তোমাদের অধিকার নাই।" এই কথা বলিয়া, তিনি তাহাদের গোচরে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ এই গোলযোগ দেখিয়া অর্জ্জুন দ্বারা কৃষ্ণদেহের অগ্নি-সংস্কার করাইলেন। হরিবংশ একটা গোলে হরিবোল দিলেন। বাস্তবিক হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, অতি সংক্ষেপে, কদম্বমূলে বাণবিদ্ধ চরণে উপদেশ দিতে দিতে দিব্যরথে চড়িয়া স্বর্গে গেলেন, লিখিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল স্পষ্ট ও বিশেষ বিবরণ লেখা হইল। তথায় লিখিত হইয়াছে, "বিভু ভগবান্ পিতামহকে এবং আপনার বিভূতি দেবতা সকলকে দর্শন করত, আপনাতে আপনাকে যোজনা করিয়া পদ্মনয়ন যুগল নিমীলন করিলেন। যাহার সর্ব্বত্র লোকের স্থিতি, এবং যাহা ধারণা ও ধ্যানের শোভন বিষয়, সেই নিজ দেহকে অগ্নিযোগ দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবেশ করিলেন।" কয়েক ছত্র পরে

আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে; "যিনি ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ঈশ্বর কি নিজের রক্ষা বিষয়ে অসমর্থ ?…… আত্মনিষ্ঠ সাধুদিগকে এই গতি প্রদর্শন করত, এই স্থানে (পৃথিবীতে) শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না।"

পাঠক, আপনি এইবার আপনার জন্য মনোনয়ন করুন। নির্ব্বোধ লোকে পুরাণগুলি চারিসহস্র বর্ষের বলুক, দাম্ভিক বেদের আশ্রয় লইতে পলায়ন করুক, ধর্ম্মহীন পাষণ্ড উপহাস করুক, শত সহস্র বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্র লিখিতে বসুন, এবং আরও সহস্র সহস্র হিন্দু সত্যের সমাদরে অসমর্থ হইয়া যিশু খৃষ্ট কৃষ্ণের অনুকরণ বলুন, কিছুই হইবে না। আমি আমার পরিত্রাতাকে চিনিয়াছি, গ্রহণ করিয়াছি এবং প্রকাশ করিতেছি। পরকাল চিন্তা করিয়া বিদ্যা মাৎসর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াছি। তাই আপনাকেও অনুরোধ করিতেছি মনকে কঠিন করিবেন না, সত্যের অনুসন্ধান করুন, অবশ্যই দর্শন পাইবেন।

২৫। আততায়ীনকে ক্ষমা।

হস্তচরণ বজ্রাঙ্কুশ বিদ্ধ অবস্থায়, নররূপী ভগবান শ্রীঈশকৃষ্ট প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" আবার ঐ অবস্থাতেই তিনি একজন দস্যুকে বলিলেন, "অদ্যই তুমি আমার সহিত পরমলোকে নীত হইবে।" লুক ২৩ ; ৩৪। এই দুইটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা অনুকরণ করণার্থ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদবিদ্ধকারী ব্যাধকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে তখনি স্বর্গে লইয়া গেলেন, এবম্বিধ

গল্প ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। পাঠক, এখন আপনি নিজে বিচার করিয়া স্থির করুন ইহাদের মধ্যে কোনটী সত্য। যিনি পাপীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিয়া স্বয়ং তাহার মুক্তির পথস্বরূপ হইয়াছেন, সেই সত্য ঈশ্বরের অবতার শাশ্বত সনাতন মহাপুরুষ শ্রী ঈশকৃষ্টেরই পক্ষে অনুতপ্ত দস্যুর প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে সেই দিনেই তাঁহার সহিত পরমলোকে নীত হইবার আজ্ঞা দেওয়াটাই কি যথার্থরূপে সঙ্গত এবং সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না?

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

ইতিপূর্ব্বে ঈশখৃষ্টের জীবন সংক্রান্ত যে সকল বৃত্তান্ত লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রচনা প্রমাণ করিয়াছি, ধর্ম্ম ও সত্য প্রিয় লোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। দুই একটী ঘটনায় সৌসাদৃশ্য থাকিলে বলিতে হইত, দৈবাৎ এই প্রকার ঘটনা উভয় জীবনে ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রকার দুই একটী একভাবাপন্ন ঘটনার সংঘটন অনেকের জীবনে পরিলক্ষিত হইতে পারে। এখানে কিন্তু সে প্রকার কথা বলিবার কোনও পথ নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুকরণ করা হইয়াছে, দেখাইয়াছি। সুতরাং বাজে কথা বলিবার আর উপায় নাই। বঙ্গবাণীতে শ্রীবীরেশ্বর সেন মহাশয়ও এই মত প্রকাশ করিয়া-

ছেন, দেখাইয়াছি। ১২ পৃষ্ঠা দেখুন। এতদ্ব্যতিত, ইহাও দেখাইয়াছি যে, সত্যপরায়ণ লেখক মাত্রেই আমার সহিত তুল্যমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ কৃষ্টের জীবন চরিতের ঐতিহাসিক প্রমাণ অতীব বিশ্বাস যোগ্য। দুরন্ত অবিশ্বাসী, বিদ্বেষী ও নাস্তিকগণেও ঈশানুকথা সমূহের ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে কোন বিতর্ক উপস্থিত করিয়া কখন জয়ী হইতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। আমি নিজে এক সময় খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত শত্রু ছিলাম এবং যথেষ্ট বিরোধী ভাব প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু যখন খৃষ্টকে কল্পনা প্রসূত ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে নিযুক্ত হইলাম, এবং যখন ধীর ভাবে হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান উভয় ধর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত ইতিহাস আলোচনায় মন দিলাম, তখন খৃষ্টই প্রমাণীকৃত হইলেন। আজ আমি তাঁহারই দাস—তাঁহারই রক্তে ক্রীত। সত্য বলিতে কি, খৃষ্ট ছাড়া আর কিছুই আমি চাহিনা। যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে সত্যই আর কখন পিপাসিত হইবে না, ইহা আমি নিজ জীবনের ঘটনা সমূহের দ্বারাই বুঝিয়াছি।

পুস্তক খানি সমাপ্ত করিবার সময়ে, কয়েকটী বিষয় স্মৃতি পথারূঢ় হওয়াতে, সেই গুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ক। কংসল্ বস্ত্র।

বাইবেলে লেখা আছে, "নিরূপিত দিবসে কংসল (হেরোদ) রাজবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের কাছে

বক্তৃতা করিলেন। তখন সকল লোক বলিতে লাগিল, এ ঈশ্বরের কথা, মানুষের নহে। আর প্রভুর দূত আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল,……তাহাতে তিনি কীট ভক্ষিত হইয়া মরিলেন।" প্রেঃ ক্রিঃ ১২; ২৩। ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া কংসল হেরোদকে সিংহাসনের উপরে আঘাত করিয়া বধ করিয়াছিলেন,—এই ঘটনা লইয়া পুরাণে সিংহাসনোপরি কংসবধ রচিত হইয়াছে। যথা,—"কংস কালধর্ম্ম কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুলীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং বিভু কৃষ্ণকে আকাশ হইতে আগত বলিয়াই বোধ করিল। অনন্তর কৃষ্ণ স্বীয় পরিঘসন্নিভ বাহু আয়ত্ত করত রঙ্গ মধ্যে কংসের কেশ আকর্ষণ করিলেন।" লেখা আছে, "তদীয় দেহে মাংসচ্ছেদ ঘন জীবিতান্তকারী কেশবার্পিত নখাগ্র চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইল।" হরিবংশ পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পাঠক, এই ঘটনাবলীর পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সাহিত্যরথী বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ চরিত্রে লিখিয়াছেন, "হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবধ বৃত্তান্ত কথিত আছে। কংস বধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতা শূন্য।" আমরাও তাহাই বলি। কেননা কংসবধ হইল যুদাদেশে, ভারতের পক্ষে ইহা অবশ্যই অনৈতিহাসিক। এ কথা কে না বলিবে?

ঞ। মুষলং কুলনাশনং।

ঈশ্বর যুদাবংশের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া, ভাববাদী দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য

এক মাশৈরা (Machaira) পাঠাইব।' তৎপরে যিরমীয় ভাববাদী আসিয়া বলিলেন, "দেখ আমি এই দেশ নিবাসী সমস্ত লোককে, অর্থাৎ সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণকে, পুরোহিত ও ভাববাদীগণকে এবং যিরুশালেম নিবাসী সমস্ত লোককে সুরায় উন্মত্ত করিব। আমি একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে, হাঁ পিতাদিগকে ও পুত্রদিগকে এক সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধাইব। মমতা কি করুণা না করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিব। যির ১৩ : ১৩-১৭। আবার একবার বলিয়া পাঠাইলেন, "অন্য লোক দিগকে তাহাদের স্ত্রীবৃন্দ, এবং অন্য অধিকারী সমূহকে এই জন্য আমি তাহাদের ক্ষেত্রসমূহ প্রদান করিব।" যির ৮ : ১০। অন্যত্র বলিলেন, "স্ত্রীশুদ্ধ তাহাদের বাটী ও তাহাদের ভূমি পরের অধিকার হইবে।" যির ৬ : ১২।

পুরাণকারগণ ঐ গ্রীক শব্দ মাশৈরাকে "মুষল" করিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয় যদুকুলকে সুরাপানে উন্মত্ত করিয়াছেন। সেই বংশে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া সকলকে ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের স্ত্রী সকল এবং ক্ষেত্র সকল পরের হস্তগত করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণ দেখুন। পাঠক, এই ঘটনাটী একটী বিবেচনার বিষয় করুন। সত্য আপনিই প্রকাশ হইয়া আপনাকে দেখা দিবেন।

গ। যুগান্তে প্রভু আবার আসিবেন।

যুদাসিংহ শ্রীভগবান্ বলিলেন, 'যুগান্তে আমি আবার আসিব'। "বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে নির্গত হইয়া আকাশের পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি ভাবে

মনুষ্য পুত্রের আগমন হইবে।' মথি ২৪ ; ২৭। তিনি শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিবেন। প্রঃ বাঃ ৬ ; ২। অন্যত্র আছে, "দেখ একখানি শুভ্র মেঘ ; সেই মেঘের উপরে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে সুবর্ণমুকুট এবং তাঁহার হস্তে এক খানি তীক্ষ্ণ খড়্গ।" প্রঃ বাঃ ১৪ ; ১৫। ঠিক্ এই ভাবগুলি লইয়া, কল্কি অবতার হইবেন কল্পনা করা হইয়াছে। "ধূমকেতুমিব, শ্বেতাশ্বারূঢ়, খড়্গাধারী মহাপুরুষ ম্লেচ্ছনিবহ নিধনার্থ" আসিবেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কল্কি অবতার। কেবল তাহাই নহে,—খৃষ্ট আসিলে "গোগ ও মেগোগ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং হত হইবে," এই কথা প্রকাশিত বাক্যে উক্ত থাকায়, পুরাণকারগণ লিখিয়াছেন, কল্কি আসিলে পর "কোক ও বিকোক" তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং হত হইবে। কল্কিপুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে। পাঠক, এই ঘটনা সমূহ পাঠ করিয়া, আপনারা কি বলিতে চাহেন ? আমি যে এইগুলি কল্পনা ও অনুকরণ বলিতেছি তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

ঝ। শ্রীকৃষ্ণ ও আরাধিকা।

বাইবেলে আধ্যাত্মিকভাবে ভক্তমণ্ডলীকে "কন্যা" এবং ভগবান ঈশখৃষ্টকে "বর" বলা হইয়াছে। প্রভুর আগমনে পবিত্র মণ্ডলী চির-আকাঙ্ক্ষিত বরের সহিত মিলিত হইবেন। এই মিলনটী কোথাও 'রাজপুত্রের বিবাহ,' কোথাও "মেষশাবকের বিবাহ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিহুদীয় বিবাহ প্রথায়, বর রাত্রিকালে যেমন কন্যার বাটীতে মহাসমারোহে

গমন করেন, খৃষ্ট সেইরূপ রাত্রিকালে মহাসমারোহে নিজ মনোনীত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন। মথি ২৫ অ। যে কেহ পবিত্র, যে কেহ প্রেমিক, যে কেহ সৎ এবং যে কেহ সত্যবাদী, তাহারা সেই বিবাহ আসরে প্রবেশ করিবে আর তখন দ্বার রুদ্ধ হইবে। সকল ভক্তই প্রভুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ। এই বিবাহের কথা প্রঃ বাঃ ১৯; ৭ পদে, কল ১; ২৪ পদে এবং ১ম করি ৬; ১৫-২০ পদে উক্ত আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই স্থানে ভক্তমণ্ডলীকে খৃষ্টের ভার্য্যা করা হইয়াছে।

পৌরাণিকগণ এই প্রকার সম্মিলনই "কৃষ্ণরাধা" সম্মিলন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথার্থ বিচারে "রাধা" শব্দের মৌলিক অর্থই ভক্তমণ্ডলী। 'রা' অর্থে লোকসকল+'ধা' অর্থে যিনি ধারণ করেন। এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেম প্রকৃত আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এই বিবাহের কি বিসদৃশ ব্যাখ্যাই করা হইয়া থাকে। রাধা বলিলে যে আরাধিকা মণ্ডলী বুঝায়, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্পষ্ট করিয়া উক্ত থাকিলেও কেহ তাহা দেখেন না। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণের সময়ে রাধার জন্য দিব্যরথ আসিল এবং যত গোপিনী এবং কৃষ্ণের ষোড়শশত ভার্য্যা রাধা দেহে লুপ্ত হইল বর্ণিত আছে। গোপিনীগণ এবং ষোড়শশত ভার্য্যা ভক্তমণ্ডলী মাত্র। এই কল্পনা মনুষ্যের চিন্তা প্রসূত বলিতে কাহার সাহস হইবে? বরং কোন আদর্শ হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে এমন কথাই স্বীকার্য্য। কেবল তাহাই নহে; রাখাল-রমণীগণ কৃষ্ণকে

লক্ষ্য করিয়া যেমন তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অবিকল সেই ভাব পরমগীতে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বাইবেল হইতে দুই একটী উক্তি উদ্ধার করিতেছি।

বিরহপীড়িতা মণ্ডলী বলিতেছেন, "ঐ মম প্রিয়তমের রব! দেখ তিনি আসিতেছেন; পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকলের উপর দিয়া লম্ফে ঝম্ফে আসিতেছেন।" পঃ গীঃ ২; ৮। আবার রাখাল রমণীগণ বলিতেছেন; "গন্ধ-রস ও চন্দনে সুবাসিত হইয়া, ধূমস্তম্ভের ন্যায় প্রান্তর (গোষ্ঠ) হইতে আসিতেছেন, উনি কে?" পঃ গীঃ ৩; ৩। বাস্তবিক, শলোমন রাজার পরম গীত এই প্রকার প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর প্রেমানুরাগ পূর্ণ উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং আমার বোধ হয় এই সকল ভাব সংগ্রহ করিয়াই কৃষ্ণপ্রেম-বিধুরা রমণীগণের কথা ভাগবতে রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, এখানেও খৃষ্টকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। পাঠক, অনুরোধ করি, আপনারা অগ্রে শলোমন রাজার পরম গীত পাঠ করিয়া পরে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৬। যমুনা ও যর্দ্দন।

পুরাণ সমূহে যমুনায় কালিয় হ্রদ ছিল বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বিষ্ণু পুরাণে আছে, "সেই যমুনা মধ্যে বিষাগ্নি দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষ সমূহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।" (৫ অং; ৭ম অঃ) এই হ্রদে কালিয় বাস করিত। যমুনায় কোন কালে হ্রদ ছিল না, থাকিলে এখনও তাহা বর্ত্তমান

থাকিত। এখন দেখুন, ঘটনাটী কি? আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা যর্দ্দন নদীকে যমুনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার আমার কথা দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিতেছি। যর্দ্দন নদীতে দুইটী হ্রদ আছে; গালিলহ্রদ (Sea of Galilee) এবং মৃতহ্রদ (Dead Sea)। কিন্তু যমুনা নদীতে কুত্রাপি কোথাও হ্রদ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যর্দ্দনের গালিল হ্রদটীই শাস্ত্রকর্ত্তারা কালিয় হ্রদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যর্দ্দনে যে মৃতহ্রদ আছে তাহার জলে অতিশয় গন্ধক মিশ্রিত থাকায় এবং হ্রদের উভয় কূলে আসফ্যাল্ট (asphalt) থাকায়, উভয় কূলেই কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। অধিক কি, ঐ হ্রদ হইতে এমন তীব্র গন্ধকের ধূম নির্গত হয় যে, কোন পক্ষী ঐ হ্রদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে না। গালীলে ঐ মৃতহ্রদ আজিও আছে। ঐ হ্রদের উপকূল হইতে আসফ্যাল্ট আনাইয়া সহরের বড় বড় পথে ঢালা হইতেছে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, যর্দ্দন নদীই পুরাণের যমুনা। অতএব, এই বৃত্তান্তটী একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। সত্যের সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

গালীলবাসী লোকদিগকে 'গাওলা' বলিত এবং তথাকার অধিকাংশ লোকে পশুপালক ছিলেন। ঐ গাওলা জাতীয় লোকেরাই যিশুর শিষ্য হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী সকলকেই গোয়ালা জাতীয় এবং রাখাল বলা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা 'গালীল' শব্দটি যেমন 'কালিয়' করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, "গোগ" এবং "মেগোগ"

এই দুইটী নামও তেমনি “কোক” এবং “বিকোক” করিয়াছেন। সেইজন্য সন্দেহ হয়, হয়ত, “গিল্‌গল্‌” নামক স্থানটী ‘গোকুল’ করিয়া থাকিবেন। ঐরূপে ঈশকৃষ্টকে ঈশকৃষ্ণ, নূকে মনু; অব্রাহামকে ব্রহ্মা; যুদাকে যদু; বিঞ্জামিন্‌কে বিরিঞ্চি; অসুকে বসুদেব; হাসস্‌ (হাস্থ)কে নহুষ; যাকুবকে যযাতি; কংসলকে কংস; বৈৎলিহমকে বৃন্দাবন; বাইজান্তিন (Byzantine)কে বৈজয়ন্ত; যোনানকে (Jonian) যবন; আসের (Asher)কে অসুর, হান্নাকে পুতুনা; এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে যবনপুর করিয়া থাকিবেন।

উপসংহার।

আমি ইতিপূর্ব্বে খৃষ্ট এবং কৃষ্ণ জীবনে যে সকল সৌসাদৃশ্য দখাইয়াছি, চিন্তাশীল ভক্তের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। থাপি পুরাণ পাঠকালে দেখা যাইবে যে, পৌরাণিকগণ শকৃষ্ট জীবনের অনেকগুলি ঘটনা অনুকরণ করিতে গিয়া, কাথাও অতিরঞ্জিত, কোথাও বিকৃত এবং কোথাও বা অসংলগ্ন রিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্নে সেই জন্য তাদৃশ কয়েকটী ঘটনা র্ণনা করিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

প্রকৃত।	বিকৃত।
ক। ঈশকৃষ্ট শৈশবাবস্থায় গোপূজক মিসর দেশে নীত হন। ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে তথা হইতে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বনভূমি নাশরতে অবস্থান করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে রাজধানীতে আসিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করেন।	**ক।** শ্রীকৃষ্ণ শৈশবাবস্থায় গোকুলে নীত হন। ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে প্রচ্ছন্নভাবে বৃন্দাবনে বাস করেন। পরে দ্বাদশবর্ষ বয়সে রাজধানী মথুরায় গিয়া মল্লগণকে পরাজয় এবং বধ করেন।

এই ঘটনায় বয়সে ঐক্য রাখা হইয়াছে। তিনবার তিনস্থানে গমন ঠিক রাখা হইয়াছে। পণ্ডিতগণের পরাজয় ঘটনাটী

মল্ল পরাজয়ে পরিণত করা হইয়াছে। কেবল এইটুকু প্রভেদ থাকিলে কোন কথাই ছিল না। মনুষ্য-কপোল কল্পনা কখনই পবিত্র ও শুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে না; তাহার দৃষ্টান্ত এইখানে প্রকটিত আছে। কল্পনা এবং মাংসিক অভিলাষপূর্ণ পুরাণকারগণ স্বচ্ছন্দে ছয় সাত বর্ষ বয়সের বালকে শৃঙ্গারাদি আদিরসের তরঙ্গ লাগাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এত অল্প বয়সে এ প্রকার ভাব যে অস্বাভাবিক, তাহা তাঁহারা একবার চিন্তা করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, সুকুমার বালক দ্বারা মল্লযুদ্ধ নিপুণ যোদ্ধাদিগকে পরাজয় করান হইয়াছে। মানুষের কল্পনায় মানুষের ভাবই থাকে; সুতরাং বধ করা, হত্যাকরা কৃষ্ণের একটা করণীয় কার্য্য করিয়া বর্ণনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। খৃষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি বিনাশ করিতে আসি নাই, কিন্তু যাহাতে তাহারা পরামনন করিয়া রক্ষা পায়, তাহাই করিতে আসিয়াছি।" খৃষ্টের এই ভাব স্বর্গীয়; কেননা, তাহা মনুষ্যকপোল কল্পিত পুরাণ নহে। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ চরিত্র যে মনুষ্য কপোল কল্পিত, তাহা এই সকল উপকথা দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

প্রকৃত।	বিকৃত।
২৭। উপস্থসমাচারে আছে, ঈশ কৃষ্ট বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন।	২৭। শ্রীকৃষ্ণকেও সেইজন্য বোধকরি, বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুঃ ৫ম অং। ৬ অ; ১-২১ শ্লোক।

প্রকৃত।	বিকৃত।
গ। ঈশকৃষ্ট পথি মধ্যে একবার হারাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া ছিলেন। লূক ২ ; ৪৫।	**গ**। শ্রীকৃষ্ণও ঐ প্রকার হারাইয়া গিয়াছিলেন। লিখিত হইয়াছে, তিনি যমুনার জলে পড়িয়া যান এবং বসুদেব তাঁহাকে অণ্বেষণ করেন।
ঘ। খৃষ্ট একটী অর্জ্জুন বৃক্ষ শুষ্ক করিলেন। মথি, ২১ ; ১৯।	**ঘ**। কৃষ্ণ দুইটা অর্জ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন ও শুষ্ক করিলেন। বিষ্ণু পুঃ ৫ অং, ৬ অ।
ঙ। নিস্তার পর্ব্বের উপলক্ষে যিহুদীরা যজ্ঞ করিতেছিল। ঈশকৃষ্ট সেই দিন দুই জন শিষ্য পাঠাইয়া যাজ্ঞিকদিগের একজনের কাছে খাদ্য সামগ্রী চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সে তাঁহাকে সশিষ্যে ভোজন করিতে দিয়াছিল। মথি, ২৬ ; ১৮।	**ঙ**। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কাছে দুইজন শিষ্য (রাখাল) পাঠাইয়া দিয়া অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণীগণ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য বহন করিয়া আনিয়া রাখালগণ সহ কৃষ্ণকে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। ভাঃ ১০ স্কঃ ; ২৩ অ।
চ। মার্কের সুসমাচারে লিখিত আছে,—“সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া, শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত	**চ**। পুরাণে এই ঘটনাটী অনুকরণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডীর বনে অবস্থান কল্পনা করা হইয়াছে। এই বনবাস

প্রকৃত।	বিকৃত।
হইলেন, আর তিনি বন্য পশু সকলের সঙ্গে রহিলেন।” ১ অ; ১১ পদ।	কালে তিনি অনেক হিংস্র জন্তু, বিশেষতঃ গর্দ্ধভাসুর বধ করেন! বিঃ পুঃ ২ অং ৬৬ অঃ।
ছ। উপসুসমাচারে লিখিত আছে, “বালকগণ এক স্থানে খৃষ্টকে রাজা করিয়া, আপনারা পাত্র, মিত্র, দ্বারপাল ইত্যাদি সাজিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।” লুকের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, “তাহারা এমন বালকগণের সদৃশ যাহারা বাজারে একজন আর একজনকে ডাকিয়া বলে, তোমাদের নিকট বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না।”	**ছ**। পুরাণকারগণ এই ঘটনাটী প্রকৃত ঘটনা করিয়া ভাগবতের ১৮ অধ্যায়ে লিখিলেন, “রাম-কৃষ্ণ মাল্য ও গৈরিকধাতুতে বিভূষিত হইয়া নৃত্যগীত এবং বাহুযুদ্ধ করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন, তখন কতকগুলি বালক বাদ্য করে, কতিপয় বালক গান গায় অপর গোপালেরা বংশী, করতাল ও শৃঙ্গ বাজাইয়া প্রশংসা করে। তাঁহারা কোথাও দোলাবলম্বন, কোথাও নরপতিদিগের তুল্য লীলা দ্বারা খেলা করিলেন।”
জ। উপসুসমাচারে আছে, একদা নাসরতের কোন পর্ব্বতে যিহুদীগণ খৃষ্টকে বধ	**জ**। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ সোমন্ত পর্ব্ব-

প্রকৃত।	বিকৃত।
করিবার জন্য, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিয়া, তাহাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ঘটনাটী লুকের সুসমাচারেও আছে কিন্তু লম্ফ দিবার কোন কথা নাই। লুক ৪; ২৮-৩০।	তের উপরে দেখিয়া পর্ব্বত বেষ্টন (অবরোধ) করত বধ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ গোমন্ত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অবতরণ করেন। হরিঃ; সপ্তনবতিতম অধ্যায়।
ঝ। সয়তান খৃষ্টকে বলিয়াছিল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র, এই অভিমান ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রণাম কর, আমি তোমাকে সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব। প্রভু সেইকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, দূর হও শয়তান। তখন সে দূরীভূত হইল। মথি, ৪; ৯-১০।	**ঝ**। পৌণ্ড্রবংশীয় বাসুদেব নামক জনৈক নরপতি শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিয়া বলিল, আমিই বাসুদেব, তুমি বাসুদেব নহ। অতএব হয় নত হইয়া আমাকে পূজা কর, না হয় আমি তোমাকে বধ করিব। কৃষ্ণ ঐ সুমহাত্মা বাসুদেবকে বধ করিলেন। পুরাণে এই বৃত্তান্ত যেরূপ আছে, হরিবংশে তদপেক্ষা অনেক বাড়াবাড়ী করা হইয়াছে।

প্রকৃত।	বিকৃত।
৫। ঈশকৃষ্ট করুণাবিষ্ট হইয়া, নরকে (পাতালে) প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর লিখিত আছে, কারাবদ্ধ আত্মা সমূহ "আমরা পরাজিত হইয়াছি, আমাদিগকে উদ্ধার করুন, বলিয়া চীৎকার করিতে থাকায়" তিনি তাহাদিগকে নরকমুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশকৃষ্ট জ্বরাদি রোগের প্রতিকার করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সকল ভূত পরাজিত হইয়াছিল, বিবেচনা করিতে পারা যায়।	৫। পুরাণে লিখিত হইয়াছে. শ্রীকৃষ্ণ নরক নামক একজন দুষ্ট রাজাকে বধ করিয়া তাহার কারাগারে আবদ্ধ বহুসহস্র রাজাকে কারামুক্ত করেন। কোন পুরাণে. সহস্র কুমারীকে কারামুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন, এমন কথাও লিখিত হইয়াছে। বাণের সহিত যুদ্ধ কালে জ্বরাসুর কৃষ্ণকে আক্রমণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন, এই প্রকার কল্পনা করা হইয়াছে।
৬। খৃষ্ট অনেক শিষ্য সঙ্গে লইয়া তিবারীয় সমুদ্র পার হইতে ছিলেন। এমন সময়ে ভীষণ ঝড় উঠিল এবং মেঘ গর্জ্জন সহ বিষম বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। তরণিগুলি ডুবিবার উপক্রম হওয়াতে সকলে ভীত হইয়া খৃষ্টকে	৬। ভগবান কৃষ্ণ শিলাবর্ষণ ও অতিবাতে গোকুলের অচেতনে বিনাশ দর্শন করিয়া …বলিলেন, "গোষ্ঠ আমার শরণাপন্ন, আমি ইহাকে রক্ষা করিব। অনন্তর গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া বলিলেন. আর বাত বৃষ্টি জন্য ভয়

প্রকৃত।	বিকৃত।
বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিল, "প্রভো, আমরা মারা পড়ি, আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তখন প্রভু ধমক দিয়া ঝড় ও বৃষ্টি থামাইলেন।	করিতে হইবে না।" দেবরাজ ইন্দ্র বিফল মনোরথ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন,... এবং প্রলয় বৃষ্টি ও পবন সংযত করিলেন।
মার্ক ৪ ; ৩৫-৪১।	শ্রীভাঃ ১০ স্ক ২৪ অ।
৬। ঈশখৃষ্টকে যিহুদীরা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় দরিদ্র মাত্র দেখিয়া, তিনিই যে সেই প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা এবং ঈশ্বরাবতার তাহা স্বীকার করিল না। বরং প্রত্যেক নগরে পণ্ডিত ও সমাজপতিগণ তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। আজ তিনি গাদারীয় হইতে তাড়িত, কাল নাসরতে লাঞ্ছিত, পরশ্ব যিরুশালমে উপহাসিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে লোকেরা তাঁহার প্রাণবধ করিল। ঈশখৃষ্ট তাড়িত, লাঞ্ছিত এবং প্রহারিত হইয়াও, আততায়ি-	৬। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাবের কথা গীতায় পাওয়া যায়। তথায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "মূঢ় লোকেরা আমার তত্ত্ব না জানিয়া এবং আমি মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার অবমাননা করিয়া থাকে।" ৯ অ, ১১ পদ। কেবল তাহাই নহে ; কৃষ্ণের প্রতি তাড়নাও বড় কম বর্ণিত হয় নাই। কংস ভয়, জরাসন্ধের হিংসা, কালযবনের প্রতিদ্বন্দিতা, প্রভৃতি ভীষণ তাড়না কল্পিত হইয়াছে। দৈত্য ভয়ে গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাওয়া,

প্রকৃত।	বিকৃত।
দিগকে ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। প্রতিহিংসা তিনি করেন নাই, করিতেও বলেন নাই। [illegible] [illegible] [illegible] পৃ: দেখ	বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাওয়া এবং মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় আশ্রয় লওয়া ইত্যাদি তাড়নার মধ্যেই ধরা যায়। কিন্তু কৃষ্ণ মনুষ্য কপোল কল্পিত নায়ক মাত্র বলিয়া তাঁহার জীবনে কত প্রতিশোধ, কত যুদ্ধ ও কত হত্যা দেখা যায়।

ঈশকৃষ্টের জীবন চরিতে তিনি ক্ষমাময় ঈশ্বর, দয়াময় পরিত্রাতা, স্নেহময় ভ্রাতা এবং প্রেমময় দেবতা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে মনুষ্য কপোল কল্পিত ভাব একেবারে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঠিক্ তাঁহার বিপরীত ভাবাপন্ন। ইহার কারণ এই যে, কল্পনা যতই উদার হউক না কেন, তাহাতে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা প্রতিফলিত হইবেই। গীতায় লিখিত হইল, "বিনাশায়শ্চ দুষ্কৃতান্" এবং অগ্নি পুরাণে লিখিত হইল, "অবতার ক্রিয়া দুষ্টনষ্ট্যৈ"। কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রে লিখিত হইল, "তিনি পাপীকে পরিত্রাণ করিতে" আসিলেন। মথি ১৮ ; ১১ (প্রাচীন অনুলিপি)। লুক ১৯ ; ১০। যোহন ১২ ; ৪৭। ১ম তিমথিয় ১ ; ১৫। প্রকৃত অবতার সংযত, লোভহীন, মাংসিক আসক্তিবর্জ্জিত, প্রেমময়, ক্ষমাময়, শক্তিমান এবং ত্রিকালজ্ঞ। বিকৃত অবতার

অসংযত, লোভী, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, প্রতিহিংসা-পূর্ণ, ক্ষমাহীন, দুর্দ্দান্ত এবং ভূতভবিষ্যদনভিজ্ঞ। পাঠক! আপনি এ উভয়ের মধ্যে কাহাকে হৃদয় সিংহাসন অর্পণ করিবেন?

আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নামে এদেশে শত সহস্র লোকে সেই সত্য-অবতার শ্রীঈশ কৃষ্টেরই সেবা করিতেছেন। তবে ভ্রমপূর্ণ পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি বিসর্জন দিয়া, অভ্রান্ত এবং জীবনদায়ী সুসমাচার গ্রন্থ চতুষ্টয় গ্রহণ করিতে আপত্তি কেন করিবেন?

মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, চিন্তার বহির্ভূত, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অলীক বৃত্তান্ত স্বরূপ, শ্রীভগবানের অবতার কথা পাষণ্ডের জন্য ধরাতলে প্রচারিত হয় নাই। বিচারে ও তর্কে ভগবানকে জানা যায় না; এদেশীয় উপনিষদ সমূহই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। কুক্কুর যেমন নিরস শুষ্ক অস্থিখণ্ড লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে ক্লান্ত হয়, অথচ তাহার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না; উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল পাঠ করাও তদ্রূপ পণ্ডশ্রম। কেননা তাহা দ্বারা প্রভুর দর্শনলাভ করা যায় না এবং শান্তিলাভও হয় না। ঈশকৃষ্ট শিশুদিগকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এইরূপ লোকদিগেরই স্বর্গরাজ্যে অধিকার" আছে। তিনি শাস্ত্রাধ্যাপকদিগকে কতবার তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, "তোমরা আপনারা স্বর্গে যাইবে না এবং অন্যকেও যাইতে দিবে না। বস্তুতঃ বিদ্যাভিমান, ছলনা, এবং কপটতা কুচক্রের জনক। তোমরা বিদ্বানদিগের মেওয়া (কুশিক্ষা) হইতে সাবধান হও।"

যোহনের সুসমাচারে লিখিত আছে, "তিনি আপনার অধিকারে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না।" ১; ১১। ঠিক্ এইভাবে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে,

দুর্ভগোবত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীণা ইরোড়পম্।৮
ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বেভূতাবাসসমংসত।৯
দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ
ভ্রাম্যতে ধীর্ণ তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ।১০

৩য় স্ক; ২১ অধ্যায়।

অর্থাৎ "যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন, কেননা কৃষ্ণের সহিত একত্রে বাস করিয়াও তাঁহারা তাঁহাকে হরি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। সমুদ্রবাসী মৎস্য যেমন চন্দ্রকে একটা জলচর মনে করিয়া থাকে। যদুগণ লোকের চিত্তভাব জানিতে পারিতেন, কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন না। কি আশ্চর্য্য! একস্থানে বাস করিয়াও দৈব মায়ায় কৃষ্ণকে মনুষ্য সকলের আত্মা স্বরূপ না বুঝিয়া যদুশ্রেষ্ঠই বলিতেন।" বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণই যে ঈশকৃষ্ট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছি। পুরাণাদির কৃষ্ণ "ক্ষীরোদস্যোত্তর তীরস্থ" শ্বেত দ্বীপ নিবাসী হরি, সুতরাং তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহাও বুঝাইয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিরাছি। দৈব মায়ায় যাঁহারা তাঁহাকে চিনেতে পারিবেন

না, অথবা বিদ্যাভিমানে যাঁহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে তাচ্ছিল্য করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে অতীব দুর্ভাগ্য বলিয়াই জানিব।

ধর্ম্ম মনুষ্যের নিজের ধন, হৃদয়েই তাহা সঞ্চিত হয়। সমাজের সহিত ধর্ম্মের অতি সামান্যই সম্বন্ধ আছে। যাঁহারা সামাজিক আচার ব্যবহারগুলি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। এই প্রকার ভীরু ও কাপুরুষ লোক কখন স্বর্গে স্থান পাইবে না। প্রকাঃ বাঃ ২১ ; ৮।

"ঈশ্বরকে ভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ।" প্রিয় পাঠক! আত্ম-প্রতারিত হইবেন না, ঈশ্বরকে ভয় করুন এবং সত্য গ্রহণে সাহসী হউন। তর্কের আশ্রয় লইবেন না, কারণ তর্কদ্বারা কখনও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় না। সরল হৃদয় এবং শুদ্ধ ভক্তিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার পক্ষে যথেষ্ট। ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার দ্বারা সত্যের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন না। সাধু পোল রোমীয় মণ্ডলীকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা, ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে ………। কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই ; কিন্তু আপনাদের তর্ক বিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা

মূর্খ হইয়াছে।” বাস্তবিক, তর্কের আধিক্যে আমরা আমাদিগকে মূর্খ প্রতিপন্ন করিতেছি।

জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে যিনি আরোহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই যুদাবংশীয় রাজা শলোমন, একস্থানে বলিয়াছেন, “প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয়, এবং যে বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে। বহু পুস্তক রচনার শেষ হয় না এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়। অতএব আইস আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার (সকল তর্কের শেষ মীমাংসা) শুনি ; ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের (সার) কর্ত্তব্য।” তাই বলিতেছিলাম, তর্ক পরিহার করুন এবং যিনি সত্য, পথ ও জীবন, তাঁহারই অন্বেষণ ও অনুসরণ করুন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ ধারী, মৃত্যুদর্পহারী ভগবান শ্রীঈশ কৃষ্টই আপনার সহায় হইয়া আপনার চক্ষু প্রসন্ন করিয়া দিবেন ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সমাপ্ত